বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-মার্চ । সাল-২০২৬

ঘর ঘর অভিযান

বেছে বেছে হিসাব হবে
ব্রিগেডের জনজোয়ারে মোদীর হুঙ্কার

মে মাসেই "অন্নপূর্ণা ভান্ডার"
বিজেপি সরকারে আসবে
এবং প্রতি মাসে মায়েদের হাতে
পৌঁছে দেবে ৩০০০ টাকা

বঙ্গ
কমলবার্তা
মার্চ সংখ্যা। ২০২৬

যখন রাজধর্মের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে রাজদম্ভ ৪
শমীক ভট্টাচার্য

বেছে বেছে হিসাব হবে ৬
ব্রিগেডের জনজোয়ারে মোদীর হুঙ্কার
জয়ন্ত গুহ

পরিবর্তন যাত্রা ৮
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত
কুশল কর

নিশ্চিত হারের মুখে দাঁড়িয়ে ১১
এসআইআর প্রক্রিয়ায় আক্রমণ মমতার
বিনয়ভূষণ দাশ

ধর্মতলায় ধর্না নাটক ১৫
মঞ্চস্থ হল কেন?
নারায়ণ চক্রবর্তী

ছবিতে খবর ১৮

ঘর ঘর অভিযান ২৪
বাংলার মানুষের মনের কথা
গৌতম ঘোষ

বিশ্বগুরুর মঞ্চে বিশ্বজয় ভারতীয় ক্রিকেটের ২৬
অভিরূপ ঘোষ

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইজরায়েল সফরের বার্তা ২৯
আবীর রায়গাঙ্গুলী

এআই সম্মেলনে কংগ্রেস প্রমাণ করল ৩২
কংগ্রেস দেশবিরোধী, দেশের বিকাশের বিরুদ্ধে
দিব্যেন্দু দালাল

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

২০০৬ থেকে ২০২৬। কুড়ি কুড়ি বছরের পার। অথচ সার সত্য, কেউ কথা রাখেনি। রানিমা আপনিও রাখেন নি। ক্ষমতায় এলে, বদলা নয় বদল হবে। কথা দিয়েছিলেন। মনে পড়ে? নাকি আপনারই তৈরি অচলায়তনে বসে সেকথা বোঝারও শক্তিও আপনার চলে গেছে? শুধুমাত্র বিজেপি করার জন্য আপনার জমানায় হাজার হাজার মায়ের বুক ফাঁকা হল রানিমা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সন্তান তার বাবাকে হারালো। কত কত মানুষ ঘরছাড়া হল। এমনকি এক বিজেপি কর্মীকে একটা মাঠের মধ্যে এক ঘন্টা ধরে পাঁক খাইয়ে খাইয়ে তারপর কুপিয়ে হত্যা করা হল দিনদুপুরে। হত্যার উল্লাসে সেদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল আর্তনাদ।

বিজেপি কর্মীদের রক্তে যত ভিজেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার ঘাস আর ঘাসফুল, আপনার দাপট ততই বেড়েছে। আপনি ক্রমাগত দাপুটে হয়ে উঠেছেন। ক্ষমতার অহঙ্কারে অন্ধ হয়েছেন। আপনার কি এখনও মনে পড়ে আপনি সেই ধর্না মঞ্চ থেকেই একদিন বলেছিলেন, বদলা নয় বদল চাই? সেদিন ছিলেন আপনি সাধারণ মানুষের নেত্রী, আজ দম্ভ আর বৈভবের আস্ফালনে আপনি রানিমা।

পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তাঁরা প্রজা কল্যাণের জন্য রানি রাসমণি-কে কখনও ভুলবে না। সবার হৃদয়ে তিনি শ্রদ্ধেয়া রানিমা হয়েই বেঁচে থাকবেন। আর বাংলার ইতিহাস সেই রানিকেও ভুলবে না যিনি নিজের সিংহাসন বাঁচাতে নিষ্ঠুর নির্দয় এবং নীতিহীনতার সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

রানিমা, কুড়ি বছর বাদে আজ আবার আপনি সেই ধর্না মঞ্চে। হয়তো স্মৃতি উসকে দিয়ে আবার একবার ক্ষমতায় ফিরে আসার শেষ চেষ্টা। আপনি জানেন আপনার দিন ফুরিয়েছে। যেভাবে ফুরোয় দিনের আলো। বসন্ত বাতাস। মাঝখানে অযথা বয়ে গেল কুড়িটা বছর।

সেদিন আপনি ভয় ধরিয়েছিলেন অত্যাচারী শাসকের বুকে। আর আজ আপনি সিংহাসন হারানোর ভয়ে, নিশ্চিত হারের মুখে দাঁড়িয়ে উদভ্রান্ত, দিশাহীন। আপনি জানেন আপনি চলে যাচ্ছেন। চলে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। বদলের ডাক দিয়ে ক্ষমতায় এসে আপনি নিজেই বদলে গেছেন। এবার আপনাকে বদলে দেবে মানুষ কেননা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বদলা নয় বদল চায়।

কোচবিহার থেকে হাঁসখালি, মুর্শিদাবাদ থেকে সন্দেশখালি, আরজি কর হাসপাতাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল থেকে মালদা-শিলিগুড়ি বদল চায় নির্মম অত্যাচারের। অসহ্য অপমানের। ভয় দেখানোর রাজনীতি আর নির্বাচনে খুন-ধর্ষনের। আজ নয় গত কুড়ি বছর ধরেই চেয়েছে। আপনি তখন কবিতা লেখায় ব্যস্ত ছিলেন- এপাং ওপাং ঝপাং।

যথারীতি ধর্না শেষ। এবার সময় গোনার পালা। ভাল থাকুন রানিমা। আরও অনেক অনেক কবিতা লেখার জন্য প্রস্তুত হোন। সামনে তো অনন্ত অবসর।

যখন রাজধর্মের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে রাজদম্ভ!

জালের দরজায় আঘাত করে নন্দিনী আকুল প্রশ্ন করেছিল, 'শুনতে পাচ্ছ? রাজা শুনতে পাচ্ছ?'

নন্দিনীর সেই প্রশ্ন কেবল যক্ষপুরীর রাজার কানে পৌঁছোনোর আর্তি ছিল না। তা ছিল যন্ত্রসভ্যতার পাষাণপ্রাচীরে বিদ্ধ প্রাণের স্পন্দন। ২০২৬ সালের ৭ই মার্চ শিলিগুড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু যখন তাঁর লাঞ্ছনার কথা ব্যক্ত করলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের আকাশ-বাতাস জুড়ে নন্দিনীর সেই হাহাকারই যেন প্রতিধ্বনিত হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজকের নবান্ন যক্ষপুরীর সেই স্বর্ণলোভী রাজার চেয়েও অধিকতর পাষাণ এবং অহঙ্কারী। সেখানে ক্ষমতার দম্ভ ছাপিয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক প্রাণের স্পন্দন। সেখানে সংবিধানের চেয়ে বড় একনায়কতন্ত্রের দাপট।

ভারতের প্রথম নাগরিক, এক জনজাতীয় নারী যখন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখেন, তখন শিষ্টাচার অনুযায়ী তাঁর পথ কুসুমাস্তীর্ণই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন উপহার দিল এক সুপরিকল্পিত উপেক্ষা এবং অসম্মান। শিলিগুড়ির বিধাননগরের প্রশস্ত মাঠ থেকে রাষ্ট্রপতির সভাকে গোঁসাইপুরের সঙ্কীর্ণ, এক ঘিঞ্জি কোণে সরিয়ে দেওয়া কেবল স্থানাঙ্ক পরিবর্তন ছিল না, ছিল ভারতের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদকে 'একঘরে' করার কদর্য প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র।

কবি বলেছেন, 'মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও/ মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।' পাশে এসে দাঁড়ানো তো দূর অস্ত, কলকাতার ধর্নামঞ্চে বসে রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে যে বিদ্রূপ ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তা কি কোনও সুস্থ গণতন্ত্রের ভাষা? যখন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "উনি কেন এসেছেন জানি না", তখন তো তিনি প্রকারান্তরে ভারতের সংবিধানকেই অস্বীকার করলেন! মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ

শমীক ভট্টাচার্য

আবার প্রমাণ করে দিল, পশ্চিমবঙ্গে শুধু সাংগঠনিক সঙ্কট উপস্থিত হয়নি, পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানটাই নেই! এই দম্ভ, এই ঔদ্ধত্য কি সেই পশ্চিমবঙ্গের পরিচয়, যে পশ্চিমবঙ্গ একদা বিশ্বকে শিষ্টাচার শিখিয়েছিল?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'তে নন্দিনী ছিল প্রাণের প্রতীক। আর রাজা ছিল রুদ্ধদ্বারের আড়ালে থাকা যান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এখন বাংলার শাসনব্যবস্থা সেই অভিশপ্ত যক্ষপুরীতে পরিণত। যেখানে আদিবাসী সমাজের আত্মসম্মানকে ভোটের অঙ্কে মাপা হয়, যেখানে রাষ্ট্রপতির মতো ব্যক্তিত্বকেও রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি বানানো হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন জনসমক্ষে তাঁর বিষণ্ণতা জানিয়ে বলেন, "আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী কেন আমার ওপর রাগান্বিত", তখন প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের মাথা লজ্জায় নুয়ে আসে। মুখ্যমন্ত্রী কি নিজেকে সংবিধানের উর্ধ্বে মনে করেন? তিনি কোনও পৃথক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী? যেখানে মহামান্য রাষ্ট্রপতিও একজন 'অনাহূত বহিরাগত'?

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতভুক্তি নিশ্চিত করেছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে রাষ্ট্রপতির প্রতি পরিকল্পিত অবমাননা আসলে এক গভীর অশনিসঙ্কেত। এটি কেবল এক দিনের ঘটনা নয়, এটি গত ১৫ বছরের ধারাবাহিক 'প্রশাসনিক অরাজকতা'র চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। রাজ্যপাল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা, আর এখন খোদ রাষ্ট্রপতি, এই সরকারের অসম্মানের তালিকা থেকে বাদ নেই কেউ। এই প্রশাসনের আকাশচুম্বী ধৃষ্টতা দিল্লির রাইসিনা হিলসের মর্যাদাকেও ধুলোয় মেশাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। যে পদ বা সংস্থাগুলি রাজনীতির বাইরে, তাদেরও আক্রমণ করতে ছাড়ছে না। দেশের রাষ্ট্রপতি, দেশের নির্বাচন কমিশন, হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, দেশের সেনাবাহিনী—সকলকে আক্রমণ করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।' এই লেখা লিখছি কোনও অনুরোধ করে নয়, বরং ধিক্কার জানিয়ে। যে সরকার দেশের রাষ্ট্রপতির ন্যূনতম সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না, সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও নৈতিক অধিকার নেই। নন্দিনীর মতো আমরাও জালের দরজায় আঘাত করে বলছি, "শুনতে পাচ্ছ? সাধারণ মানুষের ধিক্কার শুনতে পাচ্ছ?"

এই দম্ভের বিনাশ অনিবার্য! ইতিহাসের পাতায় দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পরিকল্পিত অপমান কলঙ্কিত অধ্যায় হিসাবে থেকে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর কতদিন এই 'সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস' মুখ বুজে সহ্য করবেন? সময় এসেছে উত্তর দেওয়ার। কারণ, মনে রাখবেন, যক্ষপুরীর সেই জাল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছিল। নবান্নের এই অহঙ্কারের জালও একদিন চুরমার হবে। আমরাই এই সরকারকে তিন বার ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় এনেছি। তাই পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে রাষ্ট্রপতির অপমানের দায় আমাদেরও। পাপস্খালন করতে হবে আমাদেরই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী,

জয় মা কালী।

আর মাত্র কয়েক মাস, তারপরেই নির্ধারিত হবে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য। আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে, তার গুরুদায়িত্ব নির্ভর করছে আপনার একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের উপর। আমার স্বপ্নের সোনার বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা আজ চরম বঞ্চনার শিকার। তাঁদের যন্ত্রণায় আমার হৃদয়ও আজ ভারাক্রান্ত। তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি একটিই সংকল্প গ্রহণ করেছি, পশ্চিমবঙ্গকে 'বিকশিত' ও সমৃদ্ধ করে তোলার সংকল্প।

গত ১১ বছরে দেশবাসীর আশীর্বাদকে পাথেয় করে, জনকল্যাণ এবং সর্বাত্মক উত্তরণকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে আমার সরকার। কৃষক ভাইদের কল্যাণ থেকে শুরু করে যুবসমাজের স্বপ্নপূরণ, কিংবা মাতৃশক্তির ক্ষমতায়ন, সর্বস্তরে আমাদের গৃহীত নীতি ও নিরলস প্রয়াসের সুফল আজ দৃশ্যমান।

রাজ্য সরকারের চরম অসহযোগিতা ও বৈরিতা সত্ত্বেও, আজ পশ্চিমবঙ্গের ৫ কোটি মানুষ কেন্দ্রীয় 'জন-ধন যোজনা'র মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতাভুক্ত হয়েছেন। 'স্বচ্ছ ভারত অভিযানে'র মাধ্যমে রাজ্যে ৮৫ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণ সম্ভব করেছি আমরা। রাজ্যের শাসকদল যখন দরিদ্র মানুষের অন্নসংস্থান কেড়ে নিচ্ছে, তখন আমরা ছোট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের ২.৮২ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। 'অটল পেনশন যোজনা'য় ৫৬ লক্ষ প্রবীণ নাগরিককে বার্ধক্যেও স্বনির্ভর করতে পেরে আমি আজ কৃতার্থ। 'উজ্জ্বলা যোজনা'র মাধ্যমে ১ কোটির বেশি পরিবারে রান্নার গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দিয়ে মা-বোনেদের ধোঁয়ার জ্বালা থেকে মুক্তি দিতে পেরে আমি ধন্য। যে অন্নদাতারা সারা দেশের ক্ষুধা নিবারণ করেন, আজ পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের নিজেদেরই অন্নের সংস্থান করতে নাভিশ্বাস উঠছে। এমতাবস্থায়, 'কৃষক সম্মান নিধি' প্রকল্পে সরাসরি আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ৫২ লক্ষের বেশি কৃষক ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এই পশ্চিমবঙ্গই ছিল দেশের অর্থনীতির দিশারী, শিল্পায়নের অগ্রদূত। অথচ, আজ পশ্চিমবঙ্গের এই রুগ্ণ ও জরাজীর্ণ দশা দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। গত ছয় দশকের অপশাসন ও তোষণমূলক রাজনীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। একদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে যুবসমাজ ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে, অন্যদিকে নিরাপত্তার অভাবে আমার পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেরা আজ শঙ্কিত ও ত্রস্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের মতো যুগপুরুষরা যে পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজ ভোটব্যাঙ্কের সংকীর্ণ রাজনীতি, হিংসা ও নৈরাজ্যে জর্জরিত। যা আমার এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্র দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'স্বাধীনতার ডাক' একদা গোটা দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজ সেই পুণ্যভূমিই অবৈধ অনুপ্রবেশ ও নারী নির্যাতনে কলঙ্কিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলায় আজ ভুয়ো ভোটারের দাপট। নৈরাজ্যের অন্ধকারে ডুবতে থাকা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে আজ সমগ্র ভারত চিন্তিত।

কিন্তু আর কতদিন আমরা মুখ বুজে সহ্য করব? এবার পরিবর্তন অপরিহার্য। আজ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটেছে। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে মিলেছে স্বাস্থ্যসুরক্ষা, যুবদের নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে নিশ্চিত এবং নারীর নিরাপত্তা হয়েছে সুনিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গেও এই প্রগতি ও বিকাশ আজ একান্ত কাম্য।

প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে আমার বিনীত আবেদন, আপনারাও এই উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হোন। আপনাদের সেবা করার একটি সুযোগের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এমন একটি সুযোগ, যেখানে কবিগুরুর ভাষায় "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির", সেখানে দুর্নীতি ও অপশাসন থেকে মিলবে মুক্তি। মা-বোনেদের নিরাপত্তা হবে সুনিশ্চিত। ঘরের ছেলে-মেয়েদের আর কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হবে না। বাংলার সংস্কৃতি ফিরে পাবে তার হৃত গৌরব। ধর্মীয় হিংসার শিকার আমাদের শরণার্থী ভাই-বোনেরা 'সিএএ' (CAA)-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাবেন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশমুক্ত এক সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে আমার পশ্চিমবঙ্গে।

ভারতমাতার বীর সন্তান ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আপ্রাণ চেষ্টাতেই পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গকে পুনরুজ্জীবিত করতে আসুন, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ২০২৬-এই 'বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ' গড়ার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করি।

আপনাদের,

নরেন্দ্র মোদী

এবার বিজেপি সরকার

বেছে বেছে হিসাব হবে

ব্রিগেডের জনজোয়ারে মোদীর হুঙ্কার

জয়ন্ত গুহ

এক সময় মনে হচ্ছিল দুর্নীতি আর দুঃসাহসের যে ঘোর আঁধারে ঢেকেছে পশ্চিমবঙ্গ তা কি আর কাটবে? ঠিক সেই সময়েই 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার'-এর মত গগনভেদী এক উচ্চারণে নিবিড় অন্ধকার চিরে ব্রিগেডের জনসভায় মোদী বললেন- বেছে বেছে হিসাব হবে। ঠিক এই আশ্বাসই শুনতে চেয়েছিল দিনরাত শাসকের অত্যাচার সহ্য করা গ্রামগঞ্জের অজস্র বিজেপি কর্মী। যারা এতদিন মুখে রক্ত তুলে শাসকের অত্যাচার সহ্য করেছে কিন্তু দলের পতাকা ছেড়ে দেয়নি।

৬ দিনের ধর্নায় উদভ্রান্ত এক স্বঘোষিত কবি-শিল্পী-বিপ্লবী চমক ধমক হুমকিতে যে দাপাদাপি করেছিলেন, ব্রিগেডের জনজোয়ারে এক নিমেষে তা ধুলোর মত উড়িয়ে দিলেন ভারতবর্ষের অবিংসবাদী নেতা নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, আগাম ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের। এ যেন এক জয়ডঙ্কার। প্রলয়ের জয়ডঙ্কার। রবি ঠাকুরের সেই রুদ্ররুপী গানের লাইন- বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার, ব্রিগেডে বাজিয়ে দিয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদী।

বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন আপাত শান্ত নির্বিকার নরেন্দ্র মোদী যে কখন কোন ব্রহ্ম মুহূর্তে ধনুকের ছিলায় টঙ্কার দেবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁকে নিয়ে কোনও ভবিষ্যৎবাণী করা হাস্যকর।

অথবা কেউ যদি ভেবে থাকে নরেন্দ্র মোদীর আর সেই তেজ নেই বা হুমকির ভয়ে তিনি নির্বিকল্প সমাধি নেবেন বা গোল করতে দিচ্ছেন মানে তিনি খেলতে জানেন না বা খেলার ইচ্ছাশক্তি নেই- তা নয়। কখনও কখনও বাধাহীন সারাবেলা খেলতে দেওয়াও একটা কৌশল। প্রতিটি ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়া প্রতিপক্ষের রক্ষণ এবং আক্রমণের গোটা মানচিত্র। আর পাশাপাশি প্রতিদিন প্রশ্রয় দেওয়া প্রতিপক্ষের আত্মবিশ্বাসে। অপেক্ষা কখন পাহাড় হয়ে ওঠে সেই আত্মবিশ্বাস। সেদিনই শুরু চূড়ান্ত আঘাতের।

আঘাতের জন্য পাল্টা আঘাতে নিছক সঙ্ঘর্ষ হয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনিই ভয়ঙ্কর যোদ্ধা যিনি শুধু জেতার জন্য যুদ্ধকে দেখছেন না। দেখছেন মানুষের কল্যাণে। যুদ্ধ তার কাছে দর্শনের লড়াই, নীতি

নৈতিকতা আর ধর্ম প্রতিষ্ঠার লড়াই। মহাভারতের লড়াই। যে লড়াই জেতার নেশায় জেতার লড়াই নয়। যেনতেন প্রকারেণ গদি বাঁচানোর লড়াই নয়। যেমনটা আমরা দেখেছি দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গে। শুধুমাত্র জনসভায় আসার জন্য বিজেপির কর্মীদের গাড়িতে ইট বৃষ্টি হয়, বিজেপি কর্মীরা জখম হন। আবার কখনও নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় আলু পেঁয়াজ কাটার মত নির্বিচারে খুন হয়ে যান বিজেপি কর্মীরা। কখনও বা ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হয় রাজ্য ছেড়ে। সাহস বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে শুধু বিজেপি কর্মীরাই নয়, নির্মম সরকারের রোষের মুখে পড়ে নির্বাচন কমিশন-ইডি সিবিআই-বিচার ব্যবস্থা-মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং দেশের সংবিধান পর্যন্ত। এক সময় মনে হচ্ছিল দুর্নীতি আর দুঃসাহসের যে ঘোর আঁধারে ঢেকেছে পশ্চিমবঙ্গ তা কি আর কাটবে? ঠিক সেই সময়েই 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার'-এর মত গগনভেদী এক উচ্চারণে নিবিড় অন্ধকার চিরে পশ্চিমবঙ্গকে আলোর দিশা দিলেন নরেন্দ্র মোদী। যখন তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ব্রিগেডের জনসভায় বললেন- বেছে বেছে হিসাব হবে। যখন তিনি বললেন- ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গে সব কা সাথ সব কা বিকাশ হবে কিন্তু পাশাপাশি চলবে সবকা হিসাব।

অফুরন্ত জীবনী শক্তি। ৭৬ বছর বয়েসে নরেন্দ্র মোদীর অফুরন্ত জীবনী শক্তির সাক্ষী থাকলো ১৪ মার্চের ব্রিগেড জনসভা। আসাম-শিলচরের কর্মসূচী মিটিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসে বুঝিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ তার এবং তার দলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ন। শুধুমাত্র রাজ্যের জন্য ১৮,৮৬০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেই ক্ষান্ত হলেন না, ভাষণের শুরুতেই বুঝিয়ে দিলেন আর তৃণমূলের হুমকি ধমকি বা ভয় দেখানোর যাত্রাপালা সহ্য করবেন না তিনি। মহা জঙ্গলরাজ শেষ হবে, বাংলার নির্মম সরকারের অন্ত হবেই- তার একথা শোনার পর ব্রিগেডের জনজোয়ার ভেবেছিল এখানেই আপাতত থামবেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু এর পরেই তার সেই রুদ্ররুপ। যে রুদ্ররুপে শেষ কবে নরেন্দ্র মোদীকে দেখা গেছে তা নিয়ে এখনও কোনও হদিশ নেই গোটা দেশের সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ব্রিগেডের জনসভায়,

পশ্চিমবঙ্গকে আলোর পথে নিয়ে যেতে তিনি এমন কিছু বলতে বা করতে পারেন যা তিনি কখনও করেন নি। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন- যারা অত্যাচার করবে, তাদের ছাড়া হবে না। বেছে বেছে হিসেব হবে। এই 'বেছে বেছে হিসেব হবে' যে তিনি আচমকা বলছেন না তা সোজাসুজি বুঝিয়ে দিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বললেন- তৃণমূল সরকারের যাওয়াটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মানুষ প্রকাশ্যে কথা বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এরপরেই তিনি বলছেন- 'দুসরে তরফ সবকা হিসাব'। তিনি বলছেন- বিজেপি ক্ষমতায় এলে অপরাধীদের জায়গা হবে জেল। 'এক তরফ সবকা সাথ, দুসরে তরফ সবকা হিসাব'। ব্রিগেডের সভায় এ যেন এক অন্য নরেন্দ্র মোদী। 'বেছে বেছে হিসেব' এবং 'সবকা হিসাব'-এর নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। তাঁকে নিয়ে চেনা হিসাব ভেঙ্গেচুরে তার যে বজ্রভীষণ ডঙ্কার তা বুঝতে পণ্ডিতদের অসুবিধা হলেও স্পষ্ট বুঝেছে গ্রামগঞ্জের অসহায় সাধারণ মানুষ। তৃণমূলের অত্যাচারে যে দুঃসহ রাত নেমে এসেছিল, যে পাহাড়প্রমাণ অহঙ্কারে মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অবহেলা করে সংবিধান এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি চূড়ান্ত অপমান, যে অহঙ্কারে ধর্না মঞ্চ থেকে বাঙালী হিন্দুকে শেষ করে দেওয়ার হুমকি- তাঁকে প্রতিহত করতেই নরেন্দ্র মোদীর রুদ্ররুপ। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েই তার গলায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই লাইন- তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝঙ্কার / দানবদন্ত তর্জি রুদ্র উঠিল গর্জি / লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার।

পরিবর্তন যাত্রা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত

কুশল কর

ভারতীয় জনতা পার্টির 'পরিবর্তন যাত্রা' শুধুমাত্র একটি প্রচার কর্মসূচি নয়; এই যাত্রা এক বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা। পরিবর্তনের দাবি। সংগঠন শক্তির প্রদর্শন এবং ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার একটি বিকল্প রূপরেখা। 'পরিবর্তন যাত্রা' আসলে ভাষা দিচ্ছে মানুষের মনের কথাকে। ভয় কাটিয়ে রুখে দাঁড়ানোর সাহস এই যাত্রা। জয় আমাদের নিশ্চিত। কমল ফুটছে। বিজেপি আসছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু আন্দোলন, বহু স্লোগান আবির্ভূত হয়েছে এবং কালের নিয়মে অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু কিছু মুহূর্ত থাকে যা কেবল রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে পরিসীমিত থাকে না; তা একটি মানসিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে ওঠে। আজ রাজ্যজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে যে "পরিবর্তন যাত্রা" চলছে, তা অনেকের কাছে তেমনই একটি মুহূর্ত। ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে যে **এটি কেবল একটি প্রচার অভিযান নয়; একটি রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ।**

পরিবর্তন যাত্রায় মানুষের উচ্ছ্বাস।

একসময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কয়েকটি পরিচিত শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সময় বদলেছে। মানুষের প্রত্যাশাও বদলেছে। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা—এই চারটি প্রশ্ন এখন রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জনতা পার্টি যে ভাবে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরের রাস্তায় "পরিবর্তন যাত্রা" নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তা। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দল **ভারতীয় জনতা পার্টি যে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছে; "পরিবর্তন যাত্রা"য় দিকে দিকে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তারই ইঙ্গিত বহন করে।**

রাজনীতির বড় শক্তি মানুষের সঙ্গে সংযোগ। সভামঞ্চের ভাষণ বা টেলিভিশনের বিতর্ক দিয়ে সেই সংযোগ পুরোপুরি তৈরি হয় না। মানুষের বাড়ির সামনে, গ্রামের মাঠে, শহরের রাস্তায় পৌঁছেই সেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের কর্মসূচি দলীয় সংগঠনকে যেমন শক্তিশালী করে, তেমনি মানুষের মনে একটি আন্দোলনের অনুভূতিও তৈরি করতে সমর্থ হয়। পরিবর্তন যাত্রা সেই সরাসরি যোগাযোগেরই এক জোরালো উদাহরণ। **যাত্রাপথে হাজার হাজার কর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ দেখিয়ে দিচ্ছে—রাজ্যের রাজনৈতিক বাতাসে পরিবর্তনের আভাস সমাগত! বিজেপি আসছে!**

ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বয়ানে উন্নয়ন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বয়ান হয়ে উঠেছে। আর এহেন উন্নয়নের সমার্থক হয়ে উঠেছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম। জাতীয় স্তরে নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে যে উন্নয়নমুখী প্রশাসনিক মডেল পরিস্ফুট হয়েছে—ডিজিটাল পরিষেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা—তা এখন অবিজেপি রাজ্যগুলিতে কার্যত ঈর্ষার আবহ তৈরি করেছে। পরিবর্তন যাত্রার সময় সেই উন্নয়নমুখী ভাবনাকেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট: যদি কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতির মধ্যে সমন্বয় থাকে, তাহলে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও দ্রুত বাড়তে পারে। মানুষ ভাতা চায় না; মানুষ চায় এহেন স্থায়ী উন্নয়ন যা তাঁদের বাস্তব জীবনকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভাবে গড়ে তুলবে।

বীরভূম মহম্মদ বাজার পরিবর্তন সভায় জনসমুদ্র।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। যে সরকারের আগাপাশতলা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। কেবল মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যা ভয় তৈরিই তাঁদের একমাত্র অস্ত্র। 'পরিবর্তন যাত্রা'র মাধ্যমে সেই অসন্তোষকে রাজনৈতিক ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, আইনশৃঙ্খলা এবং উন্নয়ন প্রকল্পের গতি যে অবরুদ্ধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতীয় জনতা পার্টি বিকল্প সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জোট বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনগণ।

রাজনীতিতে সংগঠনই আসল শক্তি। একটি রাজনৈতিক দলের প্রকৃত ক্ষমতা বোঝা যায় তার কর্মীদের উদ্দীপনায়। পরিবর্তন যাত্রার সময় যেভাবে হাজার হাজার কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন, তা দলীয় আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন। এই ধরনের বড় কর্মসূচি কর্মীদের মধ্যে ঐক্যবোধ বাড়ায়, নেতৃত্বের প্রতি আস্থা তৈরি করে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য সংগঠনকে প্রস্তুত করে। আমরা জানি—“যে দল রাস্তায় শক্তি দেখাতে পারে, সেই দলই ভোটের লড়াইয়ে মানসিকভাবে এগিয়ে থাকে।” তাই মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে 'পরিবর্তন যাত্রা', তৃণমূলের শাসনে অতিষ্ঠ মানুষ দু-হাত তুলে স্বাগত জানাচ্ছে 'পরিবর্তন যাত্রা'কে; তাঁরা পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে আছে; যে কোন উপায়ে এই দুর্নীতিগ্রস্ত তোলাবাজ তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করাই জনতার একমাত্র লক্ষ্য; আর এই যুদ্ধে পরিবর্তনকামী জনতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি-র সংগঠন দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। একসময় যাকে প্রধানত শহরভিত্তিক শক্তি হিসেবে দেখা হত, আজ সেই দল গ্রামাঞ্চলেও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি তৈরি করেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজ বিজেপির পতাকা উড়ছে। পরিবর্তন যাত্রা সেই সংগঠন শক্তির একটি বড় প্রদর্শন। যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতি দলের সাংগঠনিক সক্ষমতার ইঙ্গিত বহন করে। রাজনীতির ইতিহাসে দেখা যায়, বৃহৎ জনসংযোগ কর্মসূচি প্রায়ই সংগঠনকে আরও দৃঢ় করে। কারণ এতে কর্মীদের মধ্যে ঐক্যবোধ বাড়ে এবং তারা নিজেদের বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে ওঠে। রাজনীতিতে প্রতীকী কর্মসূচির গুরুত্ব অনেক। “যাত্রা” বা “পদযাত্রা” সাধারণত একটি আন্দোলনের অনুভূতি তৈরি করে—যেখানে রাজনৈতিক বার্তা শুধু বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং একটি চলমান সামাজিক সংযোগের রূপ পরিগ্রহণ করে। 'পরিবর্তন যাত্রা'র ক্ষেত্রেও একই মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। যাত্রাপথে সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্থানীয় সমস্যাকে ঘিরে আলোচনা—সব মিলিয়ে একটি রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি-র এই উদ্যোগ রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। সংগঠন শক্তির প্রদর্শন, উন্নয়নমূলক বার্তা এবং জনসংযোগ—এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে এই কর্মসূচি রাজনৈতিক আলোচনায় বিশেষ স্থান দখল করেছে।

পরিবর্তন যাত্রায় জনজোয়ার।

পশ্চিমবঙ্গ সবসময়ই রাজনৈতিকভাবে সচেতন রাজ্য। এখানে মানুষ বিতর্ক করে, প্রশ্ন করে, এবং শেষ পর্যন্ত নিজের মতামত ভোটের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই বাস্তবতায় “পরিবর্তন যাত্রা” নিছক একটি দলীয় কর্মসূচি নয়—এটি এই রাজ্যের রাজনৈতিক ভাষ্য। ভারতীয় জনতা পার্টি এই যাত্রার মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে তারা কেবল বিরোধী শক্তি হয়ে থাকতে রাজি নয়; তারা ক্ষমতার লড়াইয়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে প্রস্তুত।

আগামী বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; সাধারণ মানুষের বাঁচা-মরার লড়াই এই নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে 'পরিবর্তন যাত্রা' কার্যত মানুষের মঞ্চ প্রস্তুত করেছে। রাজনীতিতে প্রতিটি বড় নির্বাচনের আগে একটি ভাষ্য তৈরি হয়—একটি বয়ান, একটি আশা, একটি প্রতিশ্রুতি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সেই ভাষ্যের নাম: “পরিবর্তন”। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বরাবরই আবেগ, মতাদর্শ এবং গণআন্দোলনের মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক অনন্য পরিসর। স্বাধীনতার পর থেকে এই রাজ্যে একাধিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, এবং প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মানুষের প্রত্যাশা— উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আশা। কিন্তু সেই আশা এখনও পূরিত হয়নি; সেই আশা একমাত্র পূরণ করতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার। সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সাপেক্ষেও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে শুরু হওয়া “পরিবর্তন যাত্রা” নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। এটি শুধুমাত্র একটি প্রচার কর্মসূচি নয়; বরং এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা—যেখানে পরিবর্তনের দাবি, সংগঠন শক্তির প্রদর্শন এবং ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার একটি বিকল্প রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। **'পরিবর্তন যাত্রা', প্রকৃত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে, তা দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারিত হয়ে চলেছে রাজ্যের সর্বত্র। জয় আমাদের নিশ্চিত। কমল ফুটছে। বিজেপি আসছে।**

নিশ্চিত হারের মুখে দাঁড়িয়ে

এসআইআর প্রক্রিয়ায় আক্রমণ মমতার

বিনয়ভূষণ দাশ

রানীমা এবং তার দলের যতই আপত্তি থাক না কেন, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান দেখে মনে হয়, তারা এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই তবে রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। সেক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে পুরানো তালিকা অনুযায়ী নয়, বরং রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করে, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তবেই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। এই পরিস্থিতি হয়তো মমতার কল্পনাতেও আসেনি কিংবা চালে ভুল হয়েছে বেদম। ফলে খেলা শুরুর আগেই এক ডজন গোল খেয়ে এখন ল্যাজেগোবরে অবস্থা।

রাজ্যের শাসক দল এবং তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এসআইআর প্রক্রিয়া যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যাতে তিনি দাবী করতে পারেন, যেহেতু এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নির্বাচক তালিকা যথাসময়ে প্রস্তুত করা গেল না, সুতরাং ২০২৫ সালের পুরনো ভোটার তালিকা অনুযায়ীই ২০২৬ এর নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হোক।

তিনি বা তার 'প্যাক প্যাক' এজেন্সি হয়তো ভেবেছিল নির্বাচন কমিশন এবং আদালত তিতিবিরক্ত হয়ে তার আবেদনেই সীলমোহর দেবেন !অথবা এমনও হতে পারে, দিল্লিতে যে সমস্ত নামজাদা উকিলদের কথায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ও অনেক সময় প্রভাবিত হয়, তারা হয়ত মমতাকে আশ্বস্ত করেছেন, যেমন করেই হোক, তারা পুরানো ২০২৫ এর নির্বাচক তালিকা দিয়েই রাজ্যে ২০২৬-এর নির্বাচন করার ব্যবস্থা করে দেবেন সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে।আর সে জন্য যদি অনেক টাকাও লাগে দেবে গৌরী সেন! যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই হিসেব ভুল বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বালির বাঁধ দিয়ে কখনোই জলপ্রবাহ রোধ করা যায়না।

মমতার সব আশায় জল ঢেলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। খসড়া তালিকা এবং চূড়ান্ত তালিকা মিলিয়ে মোট ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জন ভোটারের নাম বাদ গেছে। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এসআইআর প্রক্রিয়াকে চেষ্টা করেও

বানচাল করতে পারবেন না জেনে শুরু থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নানাভাবে এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে এসেছেন শুরু থেকেই। প্রথমে তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, এস আই আর তিনি কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গে করতে দেবেন না। তাঁর এই সদম্ভ ঘোষণা সত্ত্বেও রাজ্যে এসআইআর শুরু হয় আরও এগারোটি রাজ্যেরই মত। তখন তিনি দম্ভোক্তি করলেন, কারও নাম বাদ দেওয়া হলে তিনি দিল্লি কাঁপিয়ে দেবেন।

কোনও কিছুই কাঁপাতে না পেরে শেষে এসআইআর প্রক্রিয়া চলতে থাকলে তিনি আবার ঘোষণা করলেন, কোন বৈধ ভোটারের নাম তিনি বাদ দিতে দেবেন না। যেন বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়াই এসআইআর-এর মূল উদ্দেশ্য । কিন্তু তার জানা উচিৎ, এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল কথাই হল, সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় থাকবে; কিন্তু অবৈধ , মৃত, স্থানান্তরিত, রোহিঙ্গা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভোটারদের নাম তালিকায় থাকবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু গুলিয়ে দিতে ভীষণ পারঙ্গম। সুতরাং তিনি এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে নানা ফন্দিফিকির খুঁজতে লাগলেন।

হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল, এই প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে পারলে তিনি ২০২৫ এর নির্বাচক তালিকার দ্বারাই নির্বাচন করতে বাধ্য করাতে পারবেন নির্বাচন কমিশনকে। বস্তুত তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে ২০২৫ এর তালিকা দিয়েই নির্বাচন করার আবেদন জানিয়েছেন এর মধ্যেই। সুতরাং তিনি বানচাল করতে না পেরে এসআইআর প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার উপায় খুঁজতে লাগলেন।

বস্তুত, ভোটার তালিকা প্রস্তুত, নির্বাচন পরিচালনা ইত্যাদি ভারতের নির্বাচন কমিশন করলেও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় রাজ্য সরকারী

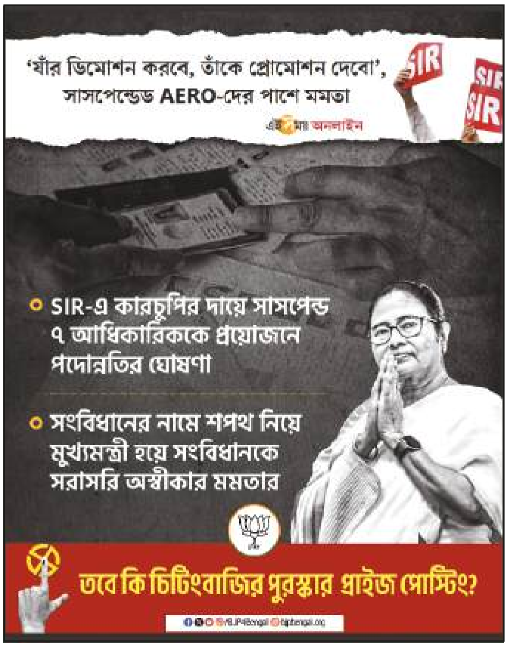

কর্মচারী এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রিত স্কুল শিক্ষকদের মাধ্যমে। আর এটা মনে রেখেই তিনি আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন যে, এইসব কর্মচারীরা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করলেও বাস্তবে তাঁরা রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং নির্বাচন শেষে তাঁদের রাজ্য সরকারের অধীনেই কাজ করতে হবে – একথা যেন তাঁরা মনে রাখেন।

এককথায়, নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করা কর্মীদের তিনি আগাম হুমকি দিয়ে ,ভয় দেখিয়ে রেখেছিলেন। রাজ্যের মুখ্য

নির্বাচন আধিকারিক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হলেও বাকি সমস্ত স্তরের নির্বাচনী আধিকারিকরা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর এই কর্মচারীদের মাধ্যমেই তিনি এসআইআর প্রক্রিয়াকে অন্তর্ঘাত করেছেন; প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত ও দীর্ঘায়িত করেছেন। ফলে কয়েকবার এই প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে নির্বাচন কমিশন।

কিন্তু না, তাতেও ২৮ ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়েও সম্পূর্ণ করা যায়নি এই প্রক্রিয়া।

কমিশন সুত্রে জানা যাচ্ছে, ২৮ তারিখে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন বৈধ নির্বাচকের পাশে 'under adjudication' লেখা রয়েছে একাধিক বার শুনানি করার পরেও। এইসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা কোন সিদ্ধান্ত না নিয়েই বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছেন। এইধরনের সমস্ত নির্বাচকই শুনানির সময় যে সমস্ত দস্তাবেজ তাঁদের কাছে চাওয়া হয়েছিল তা তাঁরা জমা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেসন' ক্যাটাগরিতে এসেছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র শুনানির সময় জমা দেওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট এইআরও / ইআরও কেন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না বা নিলেন না সে এক রহস্য ! অথচ, যে সময় ইআরও এবং এইআরও-রা পেয়েছিলেন তাতে এইসমস্ত কাজ পড়ে থাকার কথা নয়; অন্যান্য রাজ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে।

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে জানিয়েছেন, 'It will be pertinent to mention that certain names have been marked as under adjudication since the concerned ERO/AEROs did not decide them after hearing . As a result, those names being pending were sent for

adjudication by judicial officers as per order of the Hon'ble apex court.'

যদিও রাজ্যের ডবলিও বি সি এস অফিসারদের সংগঠন সম্প্রতি এটাকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে এসআইআর প্রক্রিয়ার দীর্ঘ বিলম্ব ও এই কাজ অসমাপ্ত থাকার দায় তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বলে অভিহিত করেছে। তবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে যে এই প্রক্রিয়া রূপায়ণে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ফলে কাদের হাতে এই প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়েছে সেটি তদন্ত করে দেখা বিশেষ প্রয়োজন। একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, নির্বাচক তালিকা প্রণয়ন অথবা নির্বাচন অনুষ্ঠান করা একান্তভাবেই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত; এ ক্ষেত্রে এমনকি বিচারব্যবস্থাও হস্তক্ষেপ করতে পারেনা দেশের সংবিধান অনুযায়ী। বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিচারকেরা এ মাসের ৯-১০ তারিখ নাগাদ 'সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা' প্রকাশ করবেন এবং পরে ক্রমান্বয়ে তা প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ ভোটের আগে অবধি তালিকা প্রকাশ চলবেই!

যাইহোক,এই রাজ্যে কারও নির্দেশে যে এই প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা হয়েছে তা ঘটনাক্রম থেকে পরিষ্কার। আবার গত ডিসেম্বর মাসে খসড়া তালিকা বেরনোর পরে ডিসেম্বর মাসে যারা ৮ নং ফর্মে বিভিন্ন সংশোধনের জন্য আবেদন করেছিলেন তা আড়াই মাস পার হওয়া সত্ত্বেও বস্তুত ধরাই হয়নি; যেমন জমা দেওয়া হয়েছিল তেমনই আছে। এটাও মনে হয় বিচারপতিদের দেখতে হবে ! এছাড়া আরও এক মজার ব্যাপারও ঘটেছে। এঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভোটার বা রোহিঙ্গা ভোটারদের বিরুদ্ধে কিছু করার ইচ্ছে বা সামর্থ্য না থাকলেও বৈধ নাগরিক ভোটারদের, বিশেষ করে হিন্দু ভোটারদের কিভাবে হয়রান করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করে ফেলেছেন!

এক বুথের ভোটার নামাঙ্কিত কিছু লোক হঠাৎই অন্য বুথের দীর্ঘদিনের ভোটারদের ভারতীয় নাগরিক নয় বলে অভিযোগ করেছে। যদিও অন্য বুথের ভোটারদের সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁদের জানার কথা নয় । আর এসবের ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিনের বৈধ, নাগরিক ভোটাররা যাতে নির্বাচন কমিশনের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন তার ব্যবস্থা করেছে। সাথে সাথে এইসমস্ত কারণে যাতে এসআইআর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় তার চক্রান্ত করেছে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস। এই ব্যাপারে একটা বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ১৬০, রাসবিহারী কেন্দ্রের ১৮৩ নং বুথের ভোটার জনৈক অজয় কর্মকার

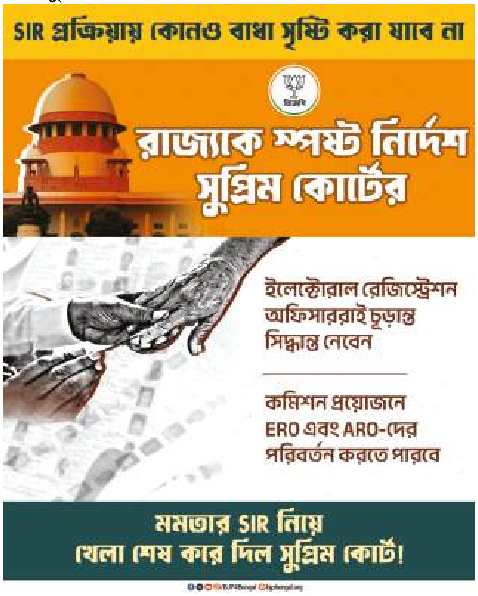

(ক্রমিক নং -৪৬৮, এপিক নং- LFB3118544) ১৪২, ১৪৩ নং বুথের বেশকিছু দীর্ঘদিনের ভোটারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তারা ভারতীয় নাগরিক নন। অথচ, দেখা গেছে, এই ভোটাররা জন্মগতভাবেই ভারতের নাগরিক। আর এই ধরণের ঘটনা যে আরও অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে একথা হলফ করে বলা যায়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন দফতরকে এইসব ভোটারদের সম্পর্কে তদন্ত করে দেখতে হবে। আর এসবের স্বাভাবিক পরিনতি হল, এসআইআর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়া।

যদিও এইসব মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কোন শাস্তি দেবার এক্তিয়ার আছে কিনা জানিনা; যদিও থাকা উচিৎ বলে মনে করি। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, জানা গেছে, নির্বাচন কমিশন কলকাতা বা অন্যান্য বড় শহরের বিভিন্ন বড় বড় হাউসিং কমপ্লেক্সে আলাদা বুথ খোলার ব্যবস্থা করেছে যাতে ভোটারদের দূরে গিয়ে ভোট দিতে না হয়, নিজস্ব কমপ্লেক্সেই তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। নিঃসন্দেহে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ এইসব কমপ্লেক্সে বসবাসকারী ভোটাররা সাধারণত দূরে গিয়ে ভোট দিতে চান না। সেইজন্য মনে হয়, নিজেদের কমপ্লেক্সে ভোটের ব্যবস্থা করলে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত হবেন, নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। কিন্তু এতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভীষণ আপত্তি! কারণ দ্বিবিধ; এক, এই ব্যবস্থায় যারা সাধারণত ভোট দেন না, তাঁরাও ভোট দেবেন। আর এই ভোট মমতার বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনাই ষোলআনা। আর এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মমতা! সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের এই যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার প্রচণ্ড বিরুদ্ধে!

তবে রানীমা এবং তার দলের যতই আপত্তি থাক না কেন, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান দেখে মনে হয়, তারা এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই তবে রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। সেক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে পুরানো তালিকা অনুযায়ী নয়, বরং রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করে, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তবেই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। রাজ্যের রাজ্যপাল বদল হয়তো সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। মমতা হয়ত এই বিকল্পটি মনে রাখেন নি। ফলে খেলা শুরুর আগেই এক ডজন গোল খেয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা। আর রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচক পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়েই আছেন, তারা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চান।

মথুরাপুর-এর জনসভা থেকে আগামী পশ্চিমবঙ্গের

রূপরেখা নিশ্চিত করলেন শ্রী অমিত শাহ

মথুরাপুরের সভা থেকে বাংলার জন্য ঐতিহাসিক ঘোষণা

১। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ৫,৭০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ।

২। গত কয়েক বছরে বেড়ে ওঠা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা।

৩। ২৬০০০ শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়ের স্বচ্ছ সমাধান ও প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

৪। দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক ছত্রছায়া সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হবে।

৫। বাংলায় অনুপ্রবেশকারী এবং মাফিয়াদের প্রভাব নির্মূল করে আইন-শৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করা হবে।

৬। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭। গুরুতর অপরাধ ও দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তি ও পরিবারকে আইনের আওতায় আনা হবে।

৮। সরকারি কর্মচারীদের ৭ম পে কমিশনের সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯। আগামী ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

১০। সরকারি চাকরিতে বাংলার যুবকদের জন্য ৫ বছরের বিশেষ বয়সসীমা ছাড়।

১১। বাংলার মা-বোনদের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু হবে।

১২। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য
প্রতিটি ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
ভারতীয় জনতা পার্টি
শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না — প্রতিশ্রুতি পূরণ করে।

ধর্মতলায় ধর্না নাটক মঞ্চস্থ হল কেন?

নারায়ণ চক্রবর্তী

কপিবুক খেলার অভ্যাস ওনার নেই। যোগ্যতাও নেই। যতটুকু ছিল ২০১৬র পর থাকেই গায়েব। দল-সরকার তখন থেকেই এজেন্সির হাতে। সাংগঠনিক কার্যক্রম বদলে যায় ইভেন্টে। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা-রাজ্যপাল বদল-সুপ্রিম ধাক্কা আর নির্বাচন কমিশনের ঠ্যালা সামলাতেই কি মন্ত্রী-সান্ত্রী নিয়ে সাজগোজ করে ধর্মতলায় ৪ রাত্রি ৫ দিনের ধর্না নাটকের এজেন্সি প্যাকেজ?

আবার ধর্না ব্যানার্জী, থুড়ি, মমতা ব্যানার্জী, ওয়াই চ্যানেলে ধর্না নাটকের মঞ্চে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে নামলেন! এবারের কারণ এসআইআর এর বিরোধিতা করে মূলত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের বর্তমানে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্তব্ধ করে দিতে চাপ সৃষ্টি করা। অবশ্যই এই নাটকের তল্পিবাহক হিসেবে সিপিএম নেমে পরেছে। যারা তাদের সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মের জন্য তৃণমূলের উপর নির্ভর করে, তাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড় নেতা সেলিম ইন্ডিজোটের সঙ্গী তৃণমূলকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে নেমে পরেছে। এবার আর "নো ভোট টু বিজেপি" জনসাধারণ নেবে না ধরে নিয়ে বাংলা প্রবাদ, "ঘোমটার তলায় খে..টা নাচা" স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সিপিএম ভোটের আসরে তৃণমূলের ভাড়া করা নাচনেওয়ালীর ভূমিকায় ভোটকাটুয়া হয়ে নামছে। তার প্রথম মহড়া হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সর্বশেষ কলকাতা সফরের সময়।

মমতার শাসক হিসেবে ব্যার্থতা এবং দুর্নীতির ফাঁকে সপরিবারে জড়িয়ে যাওয়ার কোনো সাফাই দেওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি বিরোধী নেত্রী হিসেবে হাওয়ায় সঙ্গে কল্পিত যুদ্ধে নেমেছেন। এখান থেকে তিনি আবার ভিক্টিম কার্ড খেলতে শুরু করেছেন। তাঁর সংবাদ-মাধ্যমের পদলেহনকারী সাংবাদিক ও সম্পাদকরা এই নাটকের প্রচারে নেমে পরেছে। মমতা ব্যানার্জি অতি ধূর্ত রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে বুঝতে পেরেছিলেন, এসআইআর যদি পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ করতে দেওয়া যায়, তাহলে ২০২৪এ রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে তাঁর দলের প্রাপ্ত ভোটের যে পার্থক্য ছিল, তাঁর থেকেও বেশি পার্থক্যে বিজেপি তৃণমূলের থেকে এগিয়ে থাকবে। কোনো নতুন ভাতা বা অন্য কিছু তৃণমূলের ভোট বাড়াতে সাহায্য করবে না। জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ কিছু মানুষকে দিয়ে চিরকাল

বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। সেজন্য তিনি যখন বিহারে প্রথম এসআইআর শুরু হল, তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে "নাম কাটতে দেব না" করে চেঁচামেচি ও তারপর এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে সরকারি টাকা নষ্ট করে বারবার আদালতে দৌড়ালেন। সুপ্রিম কোর্টের "সওয়াল" নাটক যখন ফ্লপ করল, ততক্ষণে প্রায় ৬০ লক্ষ মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ গেছে। প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নিয়ে এইসব "ভুতুড়ে ভোটার" এতদিন তৃণমূলের পক্ষে ভোট দিয়েছে বলে ধরা যেতে পারে; কারন, এরপর তিনি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম বিকৃত করে কুৎসিত আক্রমণ শানালেন। বোঝা যাচ্ছিল, রাজনীতি-ব্যবসায়ী ব্যানার্জি পরিবারকে বাঁচানোর রাস্তা পরিবারের কর্ত্রীর কাছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য সব সহযোগী ও চটিচাটাদের সঙ্গে নিয়ে জোট বেঁধে আবার সার্কাস দেখিয়ে নাটক (old wine in new bottle) আরম্ভ করলেন। বহু ব্যবহারে দীর্ণ নাটক কিন্তু আর চলল না। উনি ভেবেছিলেন, সিঙ্গুর সার্কাস আবার শুরু করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের হাত মুচড়ে তাদের বাধ্য করবেন ওনার কথামতো অনুপ্রবেশকারীদের নাম রাখতে।

ধর্মতলায় ধন্না।

মমতা ব্যানার্জি তুখোড় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেত্রী হওয়ায় উনি অনেক আগেই এই পরিস্থিতি অনুধাবন করে CAA করতে সরাসরি বাধা দিয়েছিলেন এবং জেহাদি অনুপ্রবেশকারীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপে প্রশাসনিকভাবে কার্যকরী বাধা দেননি। তখনও বলেছিলাম, ওঁর আসল উদ্দেশ্য CAA তে বাধা দেওয়া নয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল সব অনুপ্রবেশকারী জেহাদিদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া। সেটা না হওয়ায় তাঁর তাঁবে থাকা সরকারি কর্মচারীদের (BLO, AERO, ERO, SDO, DM, Chief Election Officer) সকলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে থাকা এবং মমতা ব্যানার্জির সরকারের থেকে পাঠানো হওয়ায়, তিনি তাদের উপর চাপ দিয়ে ওনার ইচ্ছেমত SIR এ নাম তোলা, বাদ দেওয়া এবং আপলোড করা না করা, সবকিছু করাতে গেলেন। এখন প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে কৃত্রিম মেধার ব্যবহারিক প্রয়োগে এসব অসঙ্গতি ধরা পরার পর যখন দোষীদের বিরুদ্ধে রাজ্য প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিল, উনি এবং ওঁর প্রশাসন তা প্রথমে উপেক্ষা ও পরে তার বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে সুবিধা করতে ব্যর্থ হলেন, তখন সরাসরি বললেন, এই অফিসারদের "আমি পরে প্রমোশন দেব"!

যখন তিনি কমিশনের সদর দপ্তরে এবং জনগণের টাকা খরচ করে সর্বোচ্চ আদালতে সার্কাস দেখাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, তখন তিনি বিদেশী নাগরিক, জেহাদি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় নাম রাখতে এই মেট্রো চ্যানেলে ধর্না নাটকের মঞ্চ সাজিয়ে বসলেন। তাঁর প্রশাসনের বর্তমান ও সদ্য প্রাক্তন দুই চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতায় তাদের দৌড় জানা ছিল বলে জানি, উনি এবার তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দেবেন। প্রথমত, এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারসহ পুরো নির্বাচন কমিশনকে

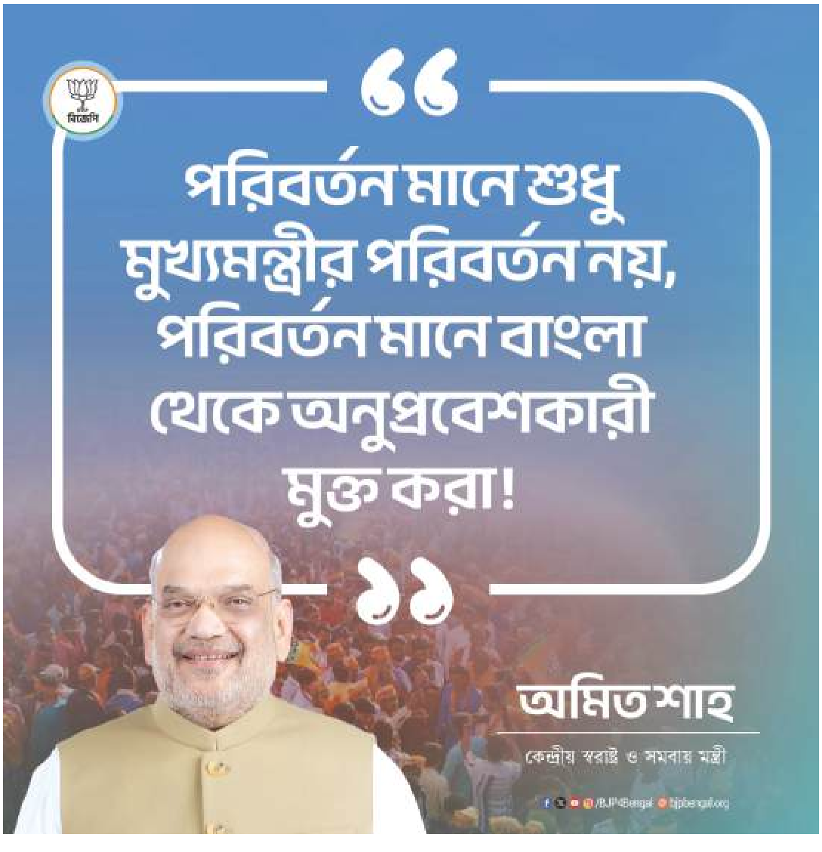

কুৎসিত, প্রথা বহির্ভূত আঘাত করে তাঁদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে গিয়ে কমিশনের নমনীয়তার রাস্তা বন্ধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি এই ধর্নায় বসে ভারতীয় সংবিধানের এমন ধারা লঙ্ঘন করেছেন, যে, তিনি ও তাঁর এই ধর্নায় অনুমোদন দেওয়া সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ আধিকারিকদের আইনের ফাঁক গলে গ্রেফতারি না এড়াতে পারার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

মমতা ব্যানার্জির ব্যাক্তিগত এবং রাজ্য প্রশাসনের জারি থাকা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মেট্রো চ্যানেলে কোনো ব্যাক্তি বা দল বা গোষ্ঠী, কাউকেই মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। ক্ষমতার দম্ভে বলীয়ান অনুপ্রেরণা দিদি ও তাঁর অনুপ্রাণিত প্রশাসন ভারতীয় সংবিধানের দুটি ধারার কথা জানেন কি? প্রথমটি হল আর্টিকেল ২২৬। এই ধারা অনুযায়ী, ভারতের যে কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার, যার মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ একটি - তা করার অধিকার স্বীকৃত। যখন, এই অধিকার ক্ষেত্র বিশেষে কাউকে দেওয়া, কাউকে না দেওয়া নিয়ে বৈষম্য করা হয়, সেখানে রাজ্যের হাইকোর্টের এক্তিয়ার আছে, এই ধারা অনুযায়ী বিচারে নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় রিট পিটিশন গ্রহণের। শুধুমাত্র এই ধারার প্রয়োগ discretionary অর্থাৎ, বিচারকের পক্ষে এটি তাঁর বিবেচনা সাপেক্ষে গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু, আর্টিকেল ৩২ এই বিষয়ে যা বলেছে, তা এই ধর্নাকে বেআইনি বলতে বাধ্য। প্রথমে বলি, এটিও নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে রিট পিটিশনের অধিকার। এটি শুধুমাত্র দেশের সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার। এই বিষয়ে কিন্তু বিচারপতির রিট গ্রহণ ও প্রতিকার দেওয়া বাধ্যতামূলক (compulsion)। বাবা সাহেব আম্বেদকর এই ধারাকে "heart and soul of Indian Constitution" বলেছিলেন। এই ধারা কখনো পাল্টানো যাবে না (infallible)। অর্থাৎ, মমতা ব্যানার্জির

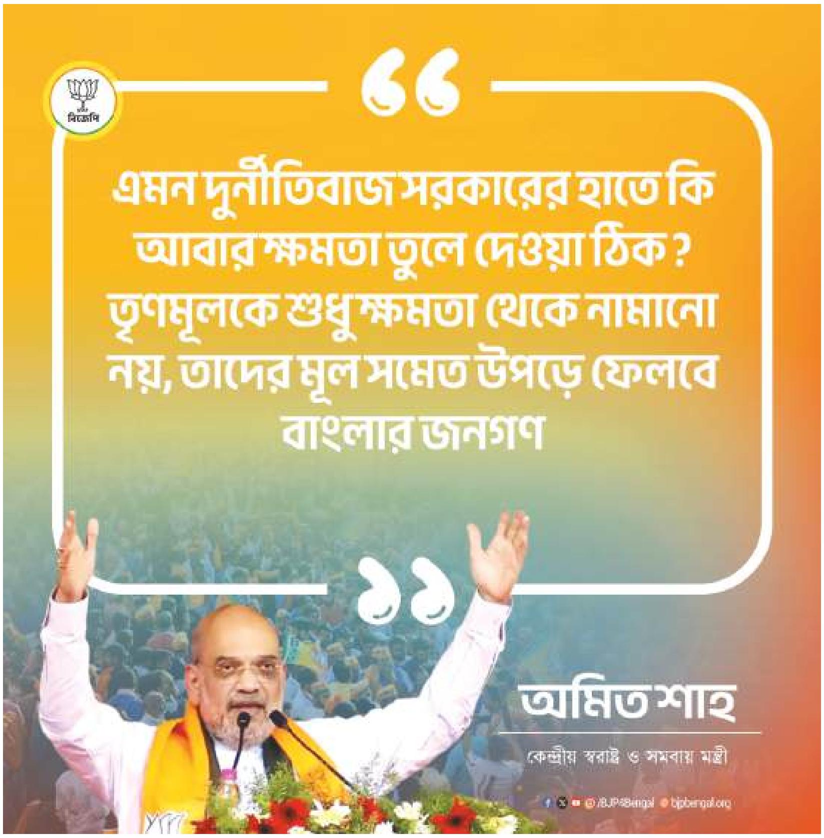

ওখানে ধর্না-নাটক চালিয়ে যাওয়া তাঁর প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষে বিপজ্জনক সাব্যস্ত হওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা।

সর্বশেষ কারণ হল, ঐ মঞ্চ থেকে পিসি-ভাইপোর দুটি মন্তব্য, যা তাদের মনের বৃহত্তর বাংলাদেশের সম্রাজ্ঞী এবং যুবরাজ হবার সুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে তীব্র ভীতির উদ্রেক করেছে। প্রথমে বলি, ভাইপোর স্বল্প বুদ্ধিতে নির্বাচন কমিশনকে দাগতে গিয়ে নিজেই ঘায়েল হয়েছে। সে বলেছে, কবিতায় বাঙালী কবি ১৮৯৬ সালে বলেছেন, "সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী, রেখেছ বাঙ্গালী করি, মানুষ কর নি" সে সময় সাত কোটি মানুষ, এখনো নির্বাচন কমিশন সাত কোটি ভোটার করে রেখেছে, যদিও সারা দেশে জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে! জাল MBAর বিদ্যা বুদ্ধি এমনই। তখন ছিল সুবে বাংলা, যেখানে বর্তমান বাংলাদেশ, বিহার ও অসমের কিয়দংশ ছিল। এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গ। এই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ভাইপোর জানা নেই। আরেকটি কথা। জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম' যেহেতু জেহাদিদের কাছে হারাম, সেহেতু ভাইপোর কাছেও হারাম। তাই বোধহয় ঐ গানের কথা, "সপ্ত কোটি কণ্ঠ নিনাদ করালে, দ্বিসপ্ত কোটি ভূজৈ ধৃত খড়করবালে" তাঁর মাথায় নেই।

এরপর আসি পিসির কথায়। তিনিও ঐ মঞ্চ থেকে বললেন, তাঁরা আছেন বলেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী (ইঙ্গিত হিন্দুদের দিকে) এখানে থাকতে পারছে। তিনি না থাকলে (ইঙ্গিত ভোটে হেরে গেলে), নাকি অন্য গোষ্ঠী (পড়ুন জেহাদি অনুপ্রবেশকারী) ঘিরে ধরে ঐ জনগোষ্ঠীকে রাজ্যছাড়া করবে। এই বক্তব্য অবশ্যই সাম্প্রদায়িক উসকানি। দেশের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরপর যদি রাজ্যের আগামী নির্বাচনে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক হিংসা বা রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে, তাঁর উস্কানির জন্য মমতা ব্যানার্জির এই উক্তি আইনত দায়ী থাকবে। এই সব কারণে ভয় পেয়ে এবং সার্কাস ফ্লপ শো হচ্ছে দেখে মমতা ধর্না নাটকের সার্কাস বন্ধ করলেন।

ছবিতে খবর

পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভা সাংসদ নির্বাচিত হয়ে জয়ের শংসাপত্র গ্রহণ প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় শ্রী রাহুল সিনহা মহাশয়ের।

দেওয়াল লিখনে নেমে পড়লেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

পরিবর্তনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে আড্ডা-আলাপচারিতায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়িয়া রামকৃষ্ণ সংঘ আয়োজিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসবে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলার আমতা বিধানসভায় এক বাইক র‍্যালিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।

পরিবর্তন যাত্রায় মালদার ইসলামপুর (ঈশ্বরপুর)-এ এক উচ্ছ্বাসে ভরপুর জনসভায় বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন।

রাজ্যজুড়ে পরিবর্তন যাত্রায় মথুরাপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় হাওড়ায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং।

পরিবর্তন যাত্রায় হিঙ্গলগঞ্জে উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পুষ্কর সিং ধামী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

নদিয়ায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী জেপি নাড্ডা।

রাজ্য জুড়ে পরিবর্তন যাত্রায় কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী নীতিন নবীন এবং রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য।

ছবিতে খবর

পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে, দুর্নীতিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় মানুষের ঢল।

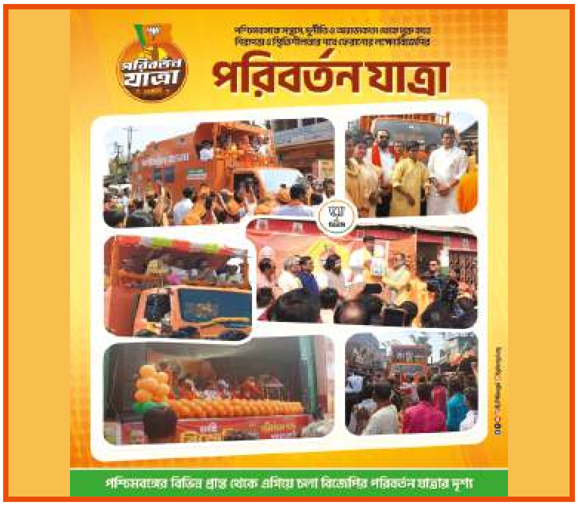

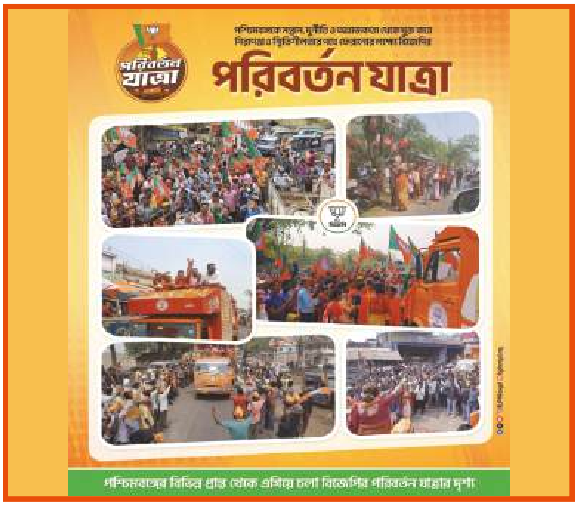

পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে, দুর্নীতিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় মানুষের উপচে পড়া উৎসাহ।

ছবিতে খবর

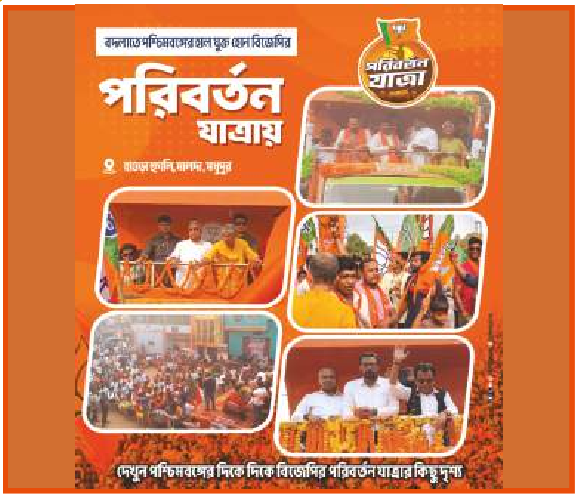

কলকাতায় বিজেপির শিক্ষক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

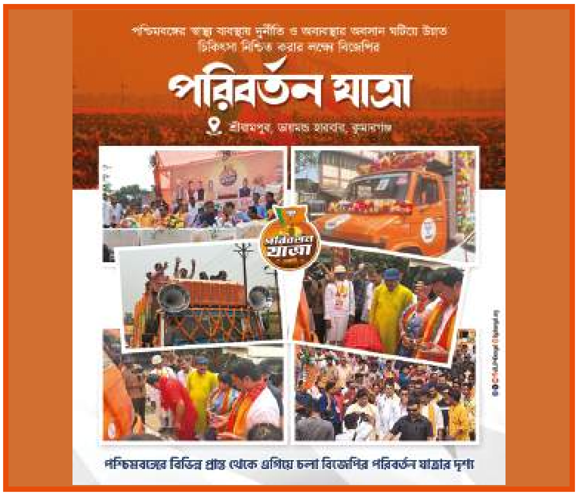

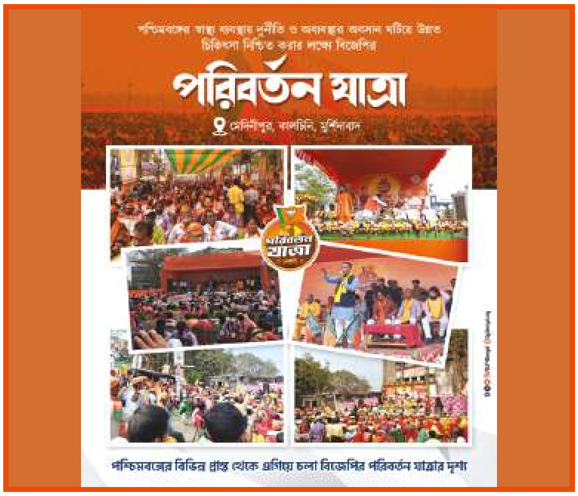

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-মহিলাদের নিরাপত্তায় পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে, দুর্নীতিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় মানুষের উচ্ছ্বাস।

ছবিতে খবর

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের উপস্থিতিতে কোলকাতা মহানগর শিক্ষক সম্মেলন।

সল্টলেক বিজেপি কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

পরিবর্তন যাত্রায় তারাপীঠে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, বিজেপি নেতা শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী এবং শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলকাতায় পরিবর্তন যাত্রার প্রস্তুতি বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ববৃন্দ।

ঘর ঘর অভিযান

বাংলার মানুষের মনের কথা

গৌতম ঘোষ

সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের মা-মাসীমা ভাইবোনদের প্রতি সাদামাঠা বাংলা ভাষায় লেখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চিঠি। যা আমরা টিভি বা খবরের কাগজে দেখেছি এক ঝলক। সেই চিঠি নিয়েই প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকেরা। শুধু চিঠি হাতে ধরিয়ে দেওয়া নয়। প্রতিটি মানুষ ও পরিবারের সঙ্গে বসে দুদণ্ড সুখদুঃখের কথা শোনা। সাধারণ মানুষের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন যোজনা বুঝিয়ে দেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিজেপি সরকারের জন্য নাগরিকদের পরামর্শ মন দিয়ে শোনা- এটাই মানুষের স্বার্থে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির ঘর ঘর অভিযান। সংকল্প পরিবর্তনের। উদ্দেশ্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলের বিকাশ।

সকালের রোদ তখন পুরোপুরি চড়ে বসেনি। সরশুনা ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের গলিতে গলিতে আমরা কড়া নাড়ছি—হাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জীর চিঠি। দরজা খুলে এক প্রবীণ মা বললেন, "বাবা, এতদিন পরে কেউ আমাদের কথা শুনতে এলো!" সেই একটুকু বাক্য যেন দিনের দিশা ঠিক করে দিল। ঘর ঘর অভিযান শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছনোর এক সেতুবন্ধন।

মানুষের আস্থা—কথার চেয়ে বড়

প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে আমরা দেখেছি—মানুষের চাহিদা খুব বড় কিছু নয়; তারা চায় নিরাপত্তা, সম্মান আর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা। সরশুনার এক অটোচালক ভাই বললেন, "রাস্তা, আলো, জল—এসব নিয়ে লড়াই করেছি অনেক। কিন্তু এখন চাই ছেলের জন্য চাকরি, মেয়ের জন্য নিরাপদ ভবিষ্যৎ।"

এই কথাগুলোতে রাজনীতি নেই, আছে বাস্তবতা। ঘর ঘর অভিযানের আসল সাফল্য এখানেই—মানুষ নিজেদের কথা খোলাখুলি বলতে পারছেন।

আবেগের সঙ্গে যুক্তির মেলবন্ধন

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ আমাদের হাত থেকে চিঠি নিয়ে বললেন, "সরকারের প্রকল্পের কথা টিভিতে শুনি, কিন্তু সরাসরি কেউ এসে বুঝিয়ে দিলে ভালো লাগে।" আমরা যখন উজ্জ্বলা, আবাস, আয়ুষ্মান বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মতো বিভিন্ন উদ্যোগের কথা ব্যাখ্যা করলাম, তখন তাঁদের চোখে কৌতূহল ও আশার আলো দেখেছি।

আবেগ তখন যুক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কারণ উন্নয়ন শুধু পরিসংখ্যান নয়—তা মানুষের জীবনে ছোঁয়া লাগলে তবেই অর্থপূর্ণ হয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতার ঝুলি

একটি বাড়িতে গিয়ে দেখলাম—পরিবারের কর্তা দীর্ঘদিন অসুস্থ। তাঁর স্ত্রী বললেন, "চিকিৎসার খরচ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি।" আমরা তাঁকে স্বাস্থ্যবিমা ও সরকারি সহায়তার বিষয়ে জানালাম। বিদায়ের সময় তিনি বললেন, "আজ অন্তত মনে হলো আমরা একা নই।" আরেক জায়গায় এক তরুণ প্রথম ভোটার বললেন, "রাজনীতি নিয়ে হতাশা আছে, কিন্তু যদি আপনারা নিয়মিত এভাবে যোগাযোগ রাখেন, তাহলে বিশ্বাস জন্মাবে।"

এই প্রতিটি সংলাপ আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। মাঠে নামলে বোঝা যায়—মানুষ নেতার ভাষণ নয়, কর্মীর আন্তরিকতা খোঁজেন।

নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশা

এক কলেজপড়ুয়া ছাত্রী বললেন, “আমরা চাই দক্ষতা প্রশিক্ষণ আর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ুক। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব ফল চাই।”

এক তরুণ স্টার্টআপ শুরু করতে চাওয়া যুবক জানালেন, “ছোট ব্যবসার জন্য সহজ ঋণ আর গাইডেন্স দরকার। যদি স্থানীয়ভাবে সহায়তা মেলে, অনেকেই স্বনির্ভর হতে পারবে।”

তাঁদের কথায় স্পষ্ট—বাংলার যুবসমাজ শুধু দর্শক নয়, তারা অংশীদার হতে চায় উন্নয়নের যাত্রায়।

নারীশক্তির কণ্ঠস্বর

এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা বললেন, “আমরা কাজ করতে চাই, সুযোগ পেলে প্রমাণ করব।”

আরেকজন বললেন, “নিরাপত্তা ও সম্মান—এই দুটো থাকলে মেয়েরা অনেক দূর এগোতে পারে।”

ঘর ঘর অভিযানে বুঝেছি—নারীর অগ্রগতি মানেই সমাজের অগ্রগতি।

প্রান্তিক মানুষের আশা

এক দিনমজুর ভাই বললেন, “আমরা বেশি কিছু চাই না, শুধু নিয়মিত কাজ আর সঠিক মজুরি চাই।”

এক প্রবীণ শিক্ষক আমাদের বললেন, “বাংলার রাজনীতি বদলাবে তখনই, যখন কর্মীরা মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।”

এই কথাগুলো শুধু মতামত নয়—এগুলোই বাংলার মনের স্পন্দন।

ঘর থেকে হৃদয়ে

ঘর ঘর অভিযান আমাদের শিখিয়েছে রাজনীতি—দূরের মঞ্চে নয়, মানুষের ড্রয়িংরুমে তৈরি হয়। এক কাপ চায়ের আড্ডায়, বারান্দার ছোট্ট আলোচনায়, কিংবা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তৈরি হয় বিশ্বাসের ভিত।

মানুষ চায়—নিয়মিত সংযোগ, স্পষ্ট কথা, আর বাস্তব ফলাফল।

বাংলার মনের স্পন্দন

এই অভিযানে আমরা দেখেছি—বাংলার মানুষ সচেতন, প্রশ্ন করতে জানেন, যুক্তি চান। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা আবেগপ্রবণ, বিশ্বাস করলে পাশে থাকেন। উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা—এই তিনটি শব্দ তাঁদের কথায় বারবার ফিরে এসেছে।

এটাই বাংলার মনের কথা—একটি আত্মমর্যাদাশীল সমাজ, যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়তে চায়।

শেষ কথা—একটি আহ্বান

ঘর ঘর অভিযান আমাদের কাছে শুধু প্রচার নয়, এটি এক আত্মিক দায়িত্ব। প্রতিটি কড়া নাড়ায় আমরা শুনেছি আশা, দেখেছি প্রত্যাশা। এখন সময় সেই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার।

আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজেদের ওয়ার্ড, পাড়া, গ্রামে মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়াই। রাজনীতি হোক মানুষের সমস্যার সমাধানের পথ।

বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাক উন্নয়নের বার্তা, আস্থার হাত এবং নতুন দিনের স্বপ্ন।

ঘর ঘর অভিযান হোক বাংলার পরিবর্তনের অঙ্গীকার—ঘর থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে ইতিহাসে।

বিশ্বগুরুর মঞ্চে বিশ্বজয় ভারতীয় ক্রিকেটের

অভিরূপ ঘোষ

২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই জয় শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট ট্রফি জেতার ঘটনা নয়, বরং এটি ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামো, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারত আবারও টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। **এই সাফল্যের পেছনে যেমন খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম রয়েছে, তেমনি রয়েছে সরকারের সহায়তা, ক্রীড়া প্রশাসনের পরিকল্পনা এবং দেশের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন।** সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ধারাবাহিকভাবে আইসিসি ট্রফি জয় করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেদের আধিপত্য আরও সুদৃঢ় করেছে। সেই ধারাবাহিক সাফল্যেরই আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায় হল ২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়।

প্রথমত, **মোদী সরকারের আমলে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত এক দশকে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। "খেলো ইন্ডিয়া"র মতো কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও প্রতিভা উঠে আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে।** আধুনিক স্টেডিয়াম, উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশ নিতে পারছেন। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস এবং ক্রিকেটসহ বিভিন্ন খেলায় ভারত ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করছে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও এই উন্নতির প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়ার ফলে ভারতীয় দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের আইসিসি ট্রফি জয়ের ধারাবাহিকতাও উল্লেখ করার মতো। **এক সময় ভারতীয় ক্রিকেটকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হতো যে তারা বড় টুর্নামেন্টে ভালো খেললেও শেষ পর্যন্ত ট্রফি জিততে পারে না। কিন্তু সেই ধারণা এখন বদলে গেছে।** ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। এরপর কয়েকদিন আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। গত কয়েক বছরে ভারত একাধিক আইসিসি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা শুধু প্রতিভাবান দলই নয়, বড় মঞ্চে সাফল্য অর্জনের ক্ষমতাও রাখে। এই ধারাবাহিক সাফল্য ভারতীয় ক্রিকেটের আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। ২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেই ধারাবাহিক সাফল্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

এই বিশ্বকাপ জয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসেবে এটি ভারতের গর্বের প্রতীক। কিন্তু শুরু থেকেই কিছু বিরোধী মহল এই স্টেডিয়ামকে ঘিরে নানা সমালোচনা করেছিল। কেউ কেউ একে "কুপয়া" বা কুসংস্কারের প্রতীক বলে দেখানোর চেষ্টা করেছিল। তাদের দাবি ছিল, এই স্টেডিয়ামে বড় ম্যাচে ভারত নাকি সফল হতে পারে

না। কিন্তু ২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে সেই একই স্টেডিয়ামেই ভারত জয় ছিনিয়ে নিয়ে সমস্ত সমালোচনার জবাব দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ দর্শকের উপস্থিতি এবং কোটি কোটি ভারতীয়ের উল্লাসে সেই দিন নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম হয়ে উঠেছিল জাতীয় গর্বের প্রতীক। বিরোধীদের অভিযোগ সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে জয় শাহের নামও সামনে আসে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছেলে হওয়ার কারণে অনেক সময় তাকে রাজনৈতিক আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। সমালোচকেরা অভিযোগ করেছেন যে তিনি নাকি রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু **বাস্তবতা হল, জয় শাহ ধাপে ধাপে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন। গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করা থেকে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন—সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।** তার সময়েই ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক আধুনিক সংস্কার হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ভারতের প্রভাব বেড়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটের নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও ভারত এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই প্রসঙ্গে একটি তুলনা অনেকেই টানেন। **ক'দিন আগে অভিষেক ব্যানার্জি আক্রমণ করেছে জয় শাহ-কে, শুধুমাত্র এই কারণে যে তিনি অমিত শাহের ছেলে।** এই অভিষেক ব্যানার্জি সরাসরি লোকসভা সাংসদ হিসেবে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পেয়েছিলেন, সরাসরি হয়ে গেছেন তৃণমূলের নাম্বার টু এবং মমতা ব্যানার্জির উত্তরাধিকারি। অথচ তিনি কখনও পঞ্চায়েত, পৌরসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেননি। অন্যদিকে জয় শাহ ধাপে ধাপে ক্রীড়া প্রশাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার রাজীব শুক্ল কংগ্রেসের সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেট বোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। ফলে ক্রিকেট প্রশাসনে রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে এই বাস্তবতাও বিবেচনা করা উচিত। আসলে প্রশাসনকে চরমভাবে রাজনৈতিক করে তোলা এবং কোন সরকারি অনুষ্ঠানে বিরোধী দলকে না ডাকা মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূল কংগ্রেস এই উদারতা এবং নিরপেক্ষতার মর্ম বুঝতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব এটাই যে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর জয় শাহের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের ভূমিকা যথেষ্টই বেশি। এবং সেটা তার যোগ্যতার কারণে।

এই বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং পরে বিজেপির সাংসদ ছিলেন। সেই রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে তাকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করার পর থেকেই অনেক সমালোচনা শুরু হয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন যে ক্রিকেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রাজনৈতিকভাবে পরিচিত কাউকে রাখা উচিত নয়। কিন্তু গম্ভীর নিজের কাজের মাধ্যমে সেই সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে ভারতীয় দলের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস ও আক্রমণাত্মক মানসিকতা তৈরি হয়। তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া, দলের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কঠোর অনুশীলন, ফিটনেসের উপর জোর এবং দলগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ভারতীয় দল আরও সংগঠিত হয়ে উঠেছে। ২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় সেই পরিকল্পনা ও নেতৃত্বেরই ফল।

ভারতের এই সাফল্যের পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকার কথাও অনেকেই উল্লেখ করেন। তিনি শুধু সাফল্যের সময়ই নয়, ব্যর্থতার সময়েও খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অতীতে বড় টুর্নামেন্টে পরাজয়ের পরেও তিনি দলের মনোবল বাড়ানোর জন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাদের উৎসাহিত করেছেন। এর ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে একটি ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তারা জানে যে দেশের সরকার এবং জনগণ তাদের পাশে রয়েছে। এই সমর্থন খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলাকে জাতীয় গর্বের অংশ হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় ভারতের জন্য গৌরবের মুহূর্ত। এই সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে যে সঠিক পরিকল্পনা, উন্নত পরিকাঠামো, দক্ষ প্রশাসন এবং খেলোয়াড়দের পরিশ্রম একত্রে মিললে বড় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। সমালোচনা, বিতর্ক এবং রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও মাঠে শেষ কথা বলে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স। সেই পারফরম্যান্সের মাধ্যমেই ভারত প্রমাণ করেছে যে তারা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ক্রিকেট দল।

ভবিষ্যতের দিক থেকেও এই জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য এটি এক বড় অনুপ্রেরণা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা তরুণ খেলোয়াড়রা এখন আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে পারে যে একদিন তারাও ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ জিততে পারবে। **২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তাই শুধু একটি ক্রীড়া সাফল্য নয়, বরং এটি ভারতের আত্মবিশ্বাস, ঐক্য এবং অগ্রগতির প্রতীক।** ভবিষ্যতেও ভারতীয় ক্রিকেট একইভাবে এগিয়ে যাবে এবং নতুন নতুন সাফল্যের গল্প লিখবে—এটাই দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর আশা।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াই, প্রযুক্তি ও কূটনীতি
প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইজ়রায়েল সফরের বার্তা

আবীর রায়গাঙ্গুলী

১৯৯২ সালে ভারত ইজ়রায়েলের সাথে দূতাবাস পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেয়। কার্গিল যুদ্ধের সময় ইজ়রাইলের ড্রোন থেকে তোলা এরিয়াল ফটোগ্রাফি পাকিস্তানি বাঙ্কারের সন্ধান দিয়ে, ভারতের পক্ষে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এমনকী, ১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষার পর যখন আমেরিকা তথা গোটা বিশ্ব ভারতের নিন্দা করেছিল, ইজ়রাইল তখন ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকার চোখরাঙানির তোয়াক্কা না করে।

পণ্ডিতেরা বলেন বিদেশনীতির মূল ভিত্তি হলো জাতীয় স্বার্থ আর এই জাতীয় স্বার্থের মূল তিনটি আঙ্গিক হলো – জাতীয় সুরক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জাতীয় মর্যাদা। পৃথিবীর যেকোন দেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেই এই ফর্মুলা প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ, যে কোন রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের পিছনে মোটামুটি এই তিন ধরনের স্বার্থের যেকোন একটি বা একাধিক কার্যকরী হবে। কিন্তু, এর এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম ছিল ভারতের সাথে ইজ়রায়েলের সম্পর্ক। যে ভারত ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের শর্তে স্বাধীনতা পেয়েছিল এবং আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, সেই নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্যালেস্তাইনকে ভাগ করে ইহুদিদের জন্য ইজ়রাইল রাষ্ট্র তৈরি করার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। এমনকী, ১৯৪৮ এ ইজ়রাইলের প্রতিষ্ঠার পর, ভারত প্রাথমিকভাবে ইহুদি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি। অজুহাত ছিল, ইজ়রায়েল ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট। বলার অপেক্ষা রাখেনা কারণটি কি ছিল? শুধুমাত্র মুসলমান সমাজকে তুষ্ট রাখার জন্যই যে এই সিদ্ধান্ত, তার দ্ব্যর্থহীন উল্লেখ আছে, যা সেই সময়কার বিদেশমন্ত্রকের ফাইল ঘাঁটলেই জানা যায়, যা সযত্নে ন্যাশনাল আর্কাইভে রাখা আছে। অবশেষে, ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, Her Majesty's Government (HMG) অর্থাৎ ব্রিটেনের ইজ়রায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনতি পরেই নেহেরু সিদ্ধান্ত নেন ইজ়রাইল কে স্বীকৃতি দেওয়ার। তবে, স্বীকৃতি দিলেও স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকে নয়াদিল্লি।

এই কূটনৈতিক স্বাভাবিকত্ব, অর্থাৎ দূতাবাস পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপিত হতে সময় লেগে গিয়েছিলো আরও ৪২ বছর। যদিও এই দীর্ঘ সময়ে ভারত আরব দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দেশের সাথেই

ইজ়রায়েল সফরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তবে, এই চার দশকে ভারতের তিনটি যুদ্ধেই অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল ইজ়রাইল। কিন্তু, কোন আরব দেশ এমনকি ইয়াসির আরাফাতের PLA পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দুরস্ত, নিন্দাও করেনি কোনদিন। অবশেষে, ১৯৯২ সালে ভারত ইজ়রায়েলের সাথে দূতাবাস পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেয়। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কার্গিল যুদ্ধের সময় ইজ়রাইলের ড্রোন থেকে তোলা এরিয়াল ফটোগ্রাফি পাকিস্তানি বাঙ্কারের সন্ধান দিয়ে, ভারতের পক্ষে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এমনকী, ১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষার পর যখন আমেরিকা তথা গোটা বিশ্ব ভারতের নিন্দা করেছিল, ইজ়রাইল তখন ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকার চোখরাঙানির তোয়াক্কা না করে। ভারত - ইজ়রায়েল সম্পর্ককে 'স্ট্র্যাটেজিক কোঅপারেশন' পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং, তবে ইজ়রায়েলের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে আলোচনা হতো 'ভোটব্যাঙ্ক' কে বাঁচানোর জন্য, এমনকি জাতিপুঞ্জের মতো বিশ্ব দরবারে ভারত সবসময় ইজ়রায়েলের নিন্দা করেছে এবং আরবি দেশগুলির ভাষা ও ভাষ্যকে প্রতিধ্বনিত করেছে।

ইজ়রায়েলের সাথ ভারতের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় শুরু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম দিন থেকেই। গোপন সামরিক যোগাযোগের উর্ধ্বে উঠে, ভারত ইজ়রাইলের সাথে 'strategic partnership' র বিষয়ে শুধু অকপটই নয়, সেই সম্পর্ক কে 'Special Strategic Partnership' পর্যায়ে উন্নত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ২৫- ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬- র ইজ়রায়েল সফরে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ইজ়রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রতিরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং যৌথ উৎপাদনকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। ২০২০–২৪ সময়কালে ভারত ইজ়রায়েলের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা ক্রেতা, মোট রপ্তানির প্রায় ৩৪% ভারতের কাছে গেছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ২০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোদীর এই সফর সেই প্রবণতাকে আরও সুসংহত করে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা খাতে ইজ়রায়েলি প্রযুক্তি স্থানান্তরকে আরও দ্রুততর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে। বিশেষত ড্রোন, অ্যান্টি- ড্রোন সিস্টেম, প্রিসিশন-গাইডেড মিসাইল এবং সীমান্ত নজরদারি প্রযুক্তিতে যৌথ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া

ইজ়রায়েলের সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ।

হয়েছে। দুই দেশ সামরিক ব্যবহারের উপযোগী AI-চালিত কমান্ড-কন্ট্রোল সিস্টেম, সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এবং যুদ্ধক্ষেত্র- তথ্য বিশ্লেষণ প্রযুক্তিতে যৌথ গবেষণা শুরু করতে সম্মত হয়েছে। ইজ়রায়েলের উন্নত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম (যেমন Barak সিরিজ)-এর পরবর্তী সংস্করণে ভারতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং মধ্যপ্রাচ্যের পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথ প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে দুই দেশ। ভারত-ইজ়রায়েল প্রতিরক্ষা সম্পর্ক এখন আর কেবল ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক নয়; এটি দুই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির যৌথ প্রকল্পে রূপ নিয়েছে।

প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি এই সফরের অন্যতম প্রধান সাফল্য ছিল অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত MoU-গুলির সম্প্রসারণ এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনকে পুনরুজ্জীবিত করা। দুই দেশ "Special Strategic Partnership for Peace, Innovation & Prosperity"-এর অধীনে অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চুক্তিগুলির মূল লক্ষ্য—উদ্ভাবন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং যৌথ শিল্পোৎপাদনকে ত্বরান্বিত করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও বায়োটেকনোলজিতে যৌথ গবেষণা ও বিনিয়োগ কাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহী দুই দেশ। ইজ়রায়েলের বিখ্যাত জল পুনর্ব্যবহার করার প্রযুক্তি, ড্রিপ ইরিগেসন ও কৃষি উদ্ভাবনকে ভারতের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করার রোডম্যাপ নির্ধারিত হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ইতিমধ্যেই ৩.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে; নতুন MoU-গুলি প্রযুক্তি, ফার্মা, ক্লিন- টেক ও জল প্রযুক্তিতে যৌথ বিনিয়োগ বাড়াবে। দুই দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনে বিশেষ ইনোভেশন ফান্ড গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ভারত ও ইজ়রায়েলের সম্পর্ক শুধু কৌশলগত নয়, প্রধানমন্ত্রীর মোদী এক একটি সাংস্কৃতিক ও মানবিক অভিমুখ দিতে চেষ্টা করেছেন। ইজ়রায়েলে বসবাসকারী ভারতীয় ইহুদি (indian jews)দের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ ও গুরুত্ব এই সম্প্রদায়কে দুই দেশের জনগণের মধ্যে আবেগগত সংযোগকে আরও দৃঢ় করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল,

বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধন।

ইজ়রায়েলের সংসদ নেসেটে (Knesset) তাঁর ভাষণ। যেখানে তিনি ৭ অক্টোবর ২০২৩-এর হামাসের নৃশংস হামলার পর ইজ়রায়েলের পাশে ভারতের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। মোদী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ড কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়— ভারত ইজ়রায়েলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আছে।' মোদী এই হামলাকে "বর্বর সন্ত্রাসী আক্রমণ" বলে উল্লেখ করেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি ভারতের গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, ভারত নিজেও ২৬/১১-এর মতো হামলার যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তাই সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান "zero tolerance—কোনো দ্বৈত মানদণ্ড নয়"। তিনি আন্তর্জাতিক কম্যুনিটিকে আহ্বান জানান— সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বা নীরব সমর্থন দেওয়া মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। মোদী স্পষ্টভাবে বলেন যে ভারত-ইজ়রায়েলের নিরাপত্তা উদ্বেগকে সম্মান করে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইজ়রায়েলের পাশে দাঁড়ায়। তিনি উল্লেখ করেন যে দুই দেশই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং সন্ত্রাসবাদ এই মূল্যবোধের ওপর সরাসরি আঘাত। ইজ়রায়েলি সংসদ মোদীকে 'Speaker of the Knesset Medal' প্রদান করে—যা দুই দেশের সম্পর্কের গভীরতা প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে Gaza Peace Initiative- এর প্রতি ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন, যা জাতিসংঘ অনুমোদিত একটি শান্তি-রোডম্যাপ। তাঁর মতে, 'দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য ন্যায়সঙ্গত সমাধান জরুরি।' প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ নিঃসন্দেহে শুধু ইজ়রাইলের সংসদের উদ্দেশ্য নয়, এই উক্তি ভারতেরও সেইসব রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যারা দীর্ঘদিন মানবিকতার নামে ও প্রকৃতপক্ষে দেশীয় সংখ্যালঘু তোষনের জন্য প্যালিস্টিনিয় সন্ত্রাসবাদ কে স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন, ভারতের মাটিতে সরকার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দিয়েছেন এবং বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন ইজ়রাইলের সন্ত্রাসবাদী আমাদের সন্ত্রাসবাদী নয়। নরেন্দ্র মোদী ঘরে ও বাইরে, দু জায়গার সন্ত্রাসী ও তাদের সমব্যথীদেরই এই বার্তা দিয়েছেন যা তার বিশ্বব্যাপী গ্রহনযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এআই সম্মেলনে কংগ্রেস প্রমাণ করল

কংগ্রেস দেশবিরোধী, দেশের বিকাশের বিরুদ্ধে

দিব্যেন্দু দালাল

এআই সম্মেলনে কংগ্রেসের শার্ট খুলে প্রতিবাদ। দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড়। কংগ্রেসের জোটসঙ্গী দলগুলোও এই ঘটনার সমালোচনার মুখর। শুধু জোটসঙ্গী দলই নয় ইন্ডি জোটের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রীও শার্টবিহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের সমালোচনা করেছেন। গান্ধী পরিবার নীরব।

যখন ভারত একটি মর্যাদাপূর্ণ বৈশ্বিক এআই সামিটের আয়োজন করেছে এবং প্রযুক্তিতে তার উদ্ভাবন ও নেতৃত্বকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে, ঠিক সেই সময় কংগ্রেস দল মর্যাদার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলাকেই বেছে নিল।

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা শার্ট খুলে অনুষ্ঠানস্থলে হট্টগোল সৃষ্টি করে—একটি আচরণ যা স্পষ্টভাবেই বিশ্বমঞ্চে ভারতকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

যখন দেশ নিজেকে একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করছে, তখন এ ধরনের আচরণ কেবল তাদের স্বার্থই পূরণ করে যারা ভারতের অগ্রগতি ব্যর্থ হতে দেখতে চায়। রাজনৈতিক বিরোধিতা গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু ভারতের বৈশ্বিক ভাবমূর্তিকে নষ্ট করা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

কংগ্রেসের জোটসঙ্গী দলগুলোও এই ঘটনার সমালোচনার মুখর হয়। ওয়াইএসআর কংগ্রেসের প্রধান এক্স-এ লিখেছেন, "গতকাল এআই সামিটে যুব কংগ্রেস আমাদের সবাইকে লজ্জিত করেছে। আমাদের রাজনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে! কেউই কখনও আমাদের দেশকে অপমান করা উচিত নয়।" তিনি আরও যোগ করেন, "আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন, বিশ্বের সামনে আমাদের সবসময় ঐক্যবদ্ধ মুখই তুলে ধরা উচিত।"

এদিকে বিএসপি-র সভাপতি -ও একই ধরনের মত প্রকাশ করে বলেন যে, আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন 'AI Impact Summit'-এর মতো একটি অনুষ্ঠানে যারা আধা-নগ্ন হয়ে রাগ প্রকাশ করেছে—যাদের অধিকাংশই নাকি যুব কংগ্রেসের সদস্য—তাদের এই আচরণ সম্পূর্ণরূপে অনুচিত এবং নিন্দনীয়। আরজেডি-র সাংসদ বলেছেন, অভিযোগ বা অসন্তোষ থাকতে পারে, তবে প্রতিবাদ জানানোর পদ্ধতিটি আরও ভালো হতে পারত।

কেবলমাত্র জোটসঙ্গী দলই নয় ইন্ডি জোটের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রীও শার্টবিহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের সমালোচনা করেছেন। এআই সামিটে যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মার্গারেট আলভা বলেছেন,"আমার মনে হয় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে মর্যাদা থাকতে হবে, শৃঙ্খলা থাকতে হবে এবং দায়িত্ববোধ থাকতে হবে।"

AI Impact Summit কী এবং ভারত কীভাবে এর থেকে উপকৃত হবে?

ভারত যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তখন India AI Impact Summit 2026–এর প্রস্তুতি আরও জোরদার হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত সাতটি আঞ্চলিক A I সম্মেলনের মাধ্যমে। এই সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে মেঘালয়, গুজরাট, ওডিশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং কেরালায়।

India AI Impact Summit 2026–এ ১০০-রও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বব্যাপী ৩৫,০০০-এরও বেশি নিবন্ধন সম্পন্ন হয় যা আন্তর্জাতিক আগ্রহ ও অংশগ্রহণের প্রতিফলন।

India AI Mission–এর অধীনে এবং রাজ্য সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলোর সহযোগিতায় এই সম্মেলনগুলোর আয়োজন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল অঞ্চলভিত্তিক AI অগ্রাধিকারগুলোকে দেশের সামগ্রিক ডিজিটাল রূপান্তর কর্মসূচির

সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং স্থানীয় উদ্ভাবনী পরিমণ্ডল ও জাতীয় নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা।

এই বছর ভারতে যে AI Impact Summit আয়োজিত হয়েছিল, তা তিনটি মৌলিক স্তম্ভের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এই স্তম্ভগুলিকে 'সূত্র' (Sutras) বলা হয়, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নিয়ে বৈশ্বিক সহযোগিতাকে পরিচালিত করার মূল নীতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

তিনটি সূত্র

এই তিনটি স্তম্ভ হলো— মানুষ (People), পৃথিবী (Planet) এবং অগ্রগতি (Progress)।

মানুষ (People) সূত্রটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে মানুষের অধিকার সুরক্ষা, বিভিন্ন পরিষেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং সমাজজুড়ে আস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পৃথিবী (Planet) সূত্রটি পরিবেশগত স্থায়িত্বের উপর জোর দেয়। শক্তি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবস্থার ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বশীল প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখা হয়।

অগ্রগতি (Progress) সূত্রটি উদ্ভাবন, দক্ষতা বৃদ্ধি (capacity building) এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে AI-এর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে সমর্থন করে।

সাতটি চক্র

তিনটি মৌলিক সূত্রের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, AI Impact Summit-এর আলোচনা সাতটি আন্তঃসংযুক্ত চক্রকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। এই চক্রগুলি বহুপাক্ষিক সহযোগিতার এমন কিছু ক্ষেত্রকে নির্দেশ করে, যা সমষ্টিগত শক্তিকে সমাজের সামগ্রিক রূপান্তরের দিকে পরিচালিত করার জন্য পরিকল্পিত।

এই সাতটি চক্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা মানুষ (People), পৃথিবী (Planet) এবং অগ্রগতি (Progress)-র বৃহত্তর নীতিগুলিকে বাস্তব কর্মপরিকল্পনায় রূপ দেয়। সেগুলি হলো—

1. **মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Capital)**
2. **সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য অন্তর্ভুক্তি (Inclusion for Social Empowerment)**
3. **নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য AI (Safe and Trusted AI)**
4. **সহনশীলতা বা স্থিতিস্থাপকতা (Resilience)**
5. **উদ্ভাবন ও দক্ষতা (Innovation and Efficiency)**

6. **বিজ্ঞান ও AI সম্পদের গণতন্ত্রীকরণ (Science, Democratizing AI Resources)**
7. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণের জন্য AI (AI for Economic Growth and Social Good)**

এটি ভারতের কীভাবে উপকার করবে?

এই সম্মেলনটি ভারতের প্রযুক্তি খাতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের মুহূর্ত হয়ে উঠবে। নতুন প্রযুক্তির যুগের জন্য দেশের যুবসমাজকে প্রস্তুত করতে এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) তরুণ-তরুণীকে AI দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

ভারত নিজেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি করছে এবং বিশ্বমানের প্রযুক্তিবিদ তৈরি করছে। এর ফলে সারা বিশ্বের প্রকৌশল কর্মীবাহিনীর একটি বড় অংশ ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত।

ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ জানান যে, India AI Mission-এর অধীনে কেন্দ্র সরকার ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিনি বলেন, "AI-এর দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।"

রাজ্যের নেতারাও উল্লেখ করেছেন যে, স্থানীয় স্তরেও AI গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনছে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, "মেঘালয়ের প্রতিটি গর্ভবতী মহিলাকে ডিজিটালভাবে ট্র্যাক করা হচ্ছে, যার ফলে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ (high-risk) ক্ষেত্রে দ্রুত সনাক্তকরণ ও সময়মতো হস্তক্ষেপ সম্ভব হচ্ছে।" তিনি আরও জানান, এর ফলে মাতৃমৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সহায়তা হয়েছে।

সম্মেলনের প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিকগুলি নিয়ে

ইতোমধ্যেই অসংখ্য প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয় এবং বিশেষজ্ঞ মতামতের মাধ্যমে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে এর ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য ও প্রভাবও গভীরভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, বিশেষ করে দুটি মৌলিক বিষয় বিবেচনায় রেখে: প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও উত্তেজনার সময়ে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, এটি ছিল প্রথমবার যখন একটি গ্লোবাল সাউথ দেশের মাটিতে AI সম্মেলন আয়োজিত হলো, এমন এক প্রেক্ষাপটে যেখানে বৈশ্বিক AI পরিসরের প্রায় ৭০ শতাংশ ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের নিয়ন্ত্রণে। উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বনাম নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর পক্ষে ইউরোপের অবস্থান—এই তীব্র বিতর্কও সম্মেলনটিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নৈতিক, সার্বভৌম, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বমুখী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি গ্লোবাল সাউথভুক্ত দেশগুলোর প্রয়োজন ও উদ্বেগের বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং বৈশ্বিক AI ইকোসিস্টেমে ভারতের কেন্দ্রীয় ভূমিকার রূপরেখা উপস্থাপন করেন।

তিনি শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, A I – এর আরও গণতান্ত্রিকীকরণ, বিস্তৃত প্রবেশাধিকার এবং পরিচালনাগত প্রক্রিয়াগুলিকে আরও স্বচ্ছ করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানরাও মোটের ওপর এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত পোষণ করেন, পাশাপাশি নিজেদের নির্দিষ্ট উদ্বেগ ও প্রস্তাবনাগুলিও তুলে ধরেন।

তিনি MANAV শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

M বোঝায় নৈতিক ও নীতিগত ব্যবস্থা (Moral and Ethical Systems)

A বোঝায় জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা (Accountable Governance)

N বোঝায় সহজপ্রাপ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Accessible and Inclusive)

A বোঝায় বৈধ ও গ্রহণযোগ্য (Valid and Legitimate)

V বোঝায় মূল্যবোধনির্ভর উদ্ভাবন (Value-driven Innovation)

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং তথ্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

গালগোটিয়াস বিতর্ক ও কিছু তথ্য

গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটির রোবোডগ নিয়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত AI Impact Summit-এ যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠানটির জন্য যথেষ্ট অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। যারা বিষয়টি জানেন না, তাদের জন্য বলি—গ্রেটার নয়ডার এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি চিনা রোবটকে নিজেদের উদ্ভাবন হিসেবে উপস্থাপন করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য কেন্দ্র সরকারকে দায়ী করে বিপক্ষ দলগুলি কদর্য রাজনীতি করেছে।

প্রথমেই প্রশ্ন আসে—একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের জন্য মোদী সরকারকে কেন টানা হচ্ছে? গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি সম্পূর্ণভাবে একটি বেসকারী প্রতিষ্ঠান, এটি কোনো সরকারি সংস্থা নয়। এই রোবোডগ বিতর্কের সূত্রপাত হয় একটি সাক্ষাৎকারে এক অধ্যাপকের অতিরিক্ত উৎসাহী দাবীর কারণে। তবে বিতর্ক বাড়ার পর তাদের সামিট থেকে সরে যেতে বলা হয়।

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পিআর-এর ভুল বা অতিরঞ্জন (ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক)-এর জন্য সরকারকে দোষারোপ করা আসলে অলস ও সস্তা রাজনীতি। এটা ঠিক সেইরকম, যেমন কোনো কর্পোরেট কোম্পানির বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হলে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করা।

এখন প্রশ্ন উঠছে—এই অতিরঞ্জিত ক্ষোভ কি কোনো স্পন্সর করা আক্রমণের অংশ? সরাসরি প্রমাণ পাওয়া কঠিন, কিন্তু এটাও গোপন নয় যে ভারতের দ্রুত AI অগ্রগতি অনেক বিদেশি শক্তিকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। ভারত যখন বিশাল AI Impact Summit 2026 আয়োজন করছে—যেখানে প্রায় ২.৫ লক্ষ প্রতিনিধি, ২০ জন রাষ্ট্রপ্রধান এবং OpenAI ও Google-এর মতো প্রযুক্তি কোম্পানি অংশ নিচ্ছে— তখন স্বাভাবিকভাবেই এটি কিছু মহলের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে। এমন সময়ে বিতর্ক বা নেতিবাচক প্রচার তৈরি করা সহজ উপায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ভারত যদি দ্রুত AI-তে এগিয়ে যায়, তাহলে বর্তমান প্রযুক্তিগত একচেটিয়াতেও চাপ পড়বে।

তবে বাস্তব চিত্র হলো—AI ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। স্ট্যানফোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক AI-প্রতিযোগিতামূলক দেশ। ভারত সরকার India AI Mission-এর মাধ্যমে প্রায় ১০,৩০০ কোটি টাকার উদ্যোগ নিয়েছে, যার লক্ষ্য কম্পিউট অবকাঠামো, ডেটাসেট এবং উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৭০-এর বেশি স্কেলযোগ্য AI প্রকল্প চালু হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং নৈতিক AI-এর ক্ষেত্রে ভারত গ্লোবাল সাউথের জন্য একটি সেতু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে।

তাই প্রশ্ন থেকে যায়— কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, দেশবিরোধী প্রচারের পেছনে কারা থাকতে পারে? ভারতে বসে "চিনের সেলসম্যান"দের পিছনে আসলে কাদের হাত? সমালোচকদের পিছনেই বা কাদের কালো হাত?

২৩ এবং ২৯
এপ্রিলে
পদ্মচিহ্নে BJP ভোট দিয়ে
বিজেপি
বিজেপিকে জয়ী করুন

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।